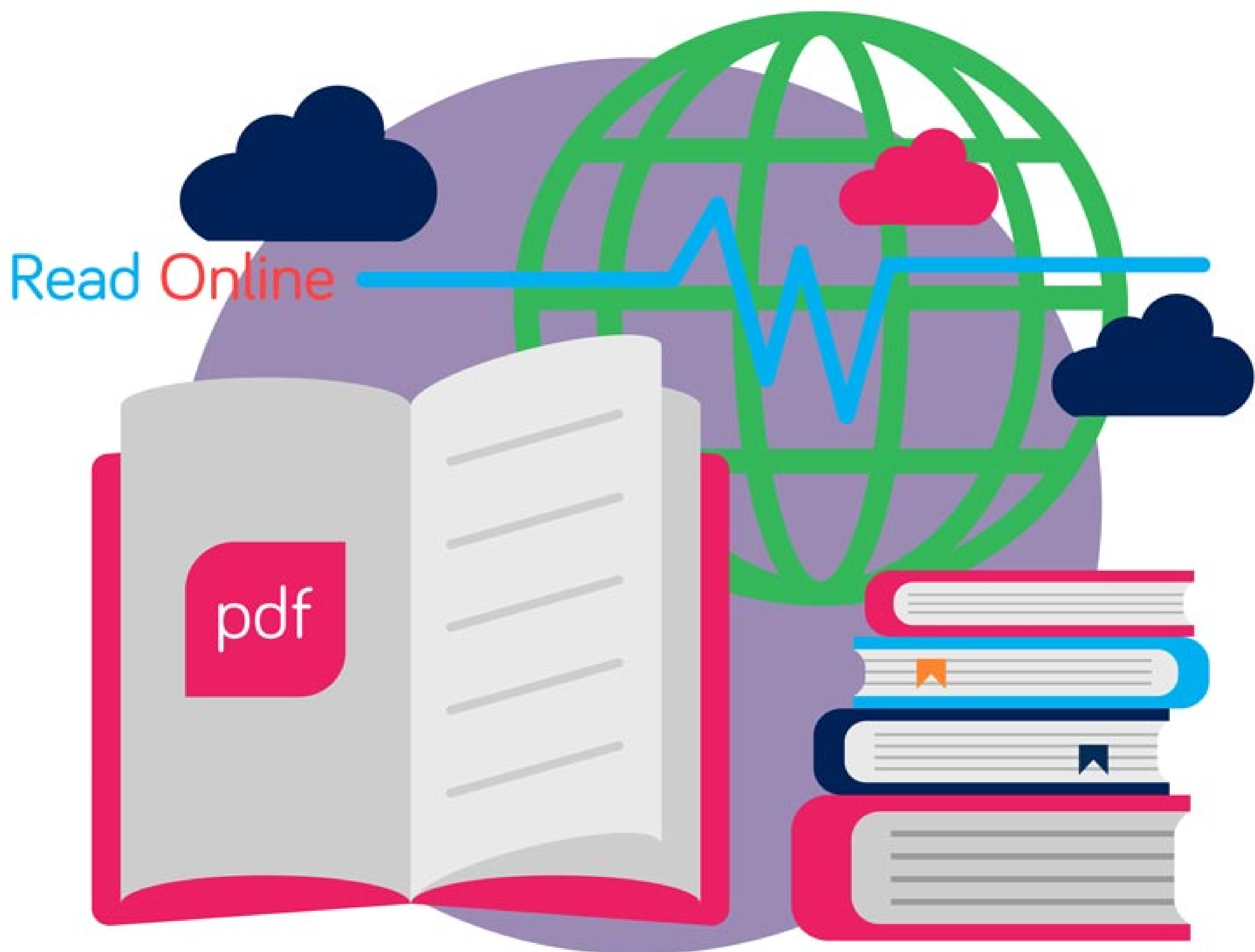



E-BOOK


আনিসুল হক
আবার তোরা কিপ্টে হ

১

আমাদের এক বন্ধু আছে নাদিম। তার বাবা আনোয়ার চৌধুরী খুবই ধনবান ব্যক্তি। কিন্তু ভীষণ কৃপণ। তার কিপ্টেমির খ্যাতি কিংবদন্তির মতো ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্বিদিক। বলা হয়ে থাকে, তিনি যদি দেখেন কোনো চিনির বয়ামে পিঁপড়ে ঢুকেছে, তিনি সেই পিঁপড়েটাকে ধরে চা চামচে রেখে তার পেট টিপে রসটুকু বের করে নেন। তারপর সেটা রেখে দেন পরের দিন সকালবেলা বরাদ্দ এক কাপ চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে খাবেন বলে। এ বিষয়ে যদি আপনি তাঁকে কোনো প্রশ্ন করেন, তিনি হেসে বলবেন, দ্যাখো, আমি চায়ে এখনও চিনি খাই, তবু আমি হলাম কিপ্টে, আর কত লোক যে চায়ে চিনি খাচ্ছে না, দুধ খাচ্ছে না, তারা কিপ্টে নয়! আর ইদানীং তো শুনতে পাচ্ছি, অনেকে শুধু গরম পানি কাপে ঢেলে খাচ্ছে, চাও লাগে না, চিনিও লাগে না, দুধ তো নয়ই। তারা কিপ্টে নয়? আরে ওরা পানি যে গরম করে, তা তিতাস গ্যাস মাসে ফিক্সড টাকা নেয় বলে, নইলে তো ওরা পানিও খেত ট্যাপ থেকে কাপে নিয়েই।

তাই তো। এমন সব লোককে কিপ্টে না বলে আনোয়ার চৌধুরীর মতো লোককে কেন যে আমরা কিপ্টে বলি।

নাদিমের বাড়িতে শুধু তার বাবা আনোয়ার চৌধুরীর বাড়িতে কী কী কাণ্ডকারখানা ঘটে, তা নিয়ে একটা গল্প এখন আমি তোমাদের শোনাব। বিশ্বাস করা না করা তোমাদের ব্যাপার। তবে একটা প্রবাদ আছে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর। বিভিন্ন মুখে ছড়ানো কাহিনীতে খানিকটা বাড়াবাড়ি থাকে, সেটুকু নিজ দায়িত্বে কাটছাঁট করে নিতে পারলে এই গল্পটা কিন্তু খুবই মজার একটা গল্প। আশা করি এই গল্পটা তোমাদের মোটামুটি বিশ্বাস হবে। আর তোমরা ভীষণ মজা পাবে।

একদিন সকালবেলার ঘটনা দিয়ে শুরু করি।

বাড়ির ছোট ছেলে নাদিম। তার বয়স ২৬, সে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পলিটিক্যাল সায়েন্সে মাস্টার্স করেছে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সে বাথরুমে গিয়ে দেখল টুথপেস্ট শেষ হয়ে এসেছে। সে খালি টিউব ধরে খানিকক্ষণ প্রবলভাবে চাপাচাপি করল। কিন্তু এই টিউব আর কত চিপানি সহ্য করবে? তার ভেতরে কিছু থাকলে সে তো দিতই। এত চাপাচাপির দরকার পড়ত না। এবার ভেতরে কিছু নেই, তাই একটুখানি পেস্টও বেরুলও না। নাদিম টুথপেস্টের টিউবটা হাতে করে বেরিয়ে এলো নিজের ঘর থেকে।

ঘর থেকে বেরুলে কমন স্পেস–ডাইনিং আর ড্রয়িং।

তার বাবা আনোয়ার চৌধুরী পত্রিকা পড়ছেন ড্রয়িং রুমে বসে। সর্বনাশ! বাবার সামনে কিছুতেই পড়া যাবে না। কক্ষনো নয়। সে মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগল, সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন... বাবার নজর এড়িয়ে চলি...

বাবার দৃষ্টি এড়িয়ে, কান বাঁচিয়ে পা টিপে টিপে সে বড় ভাবির দরজায় টোকা দিল।

ভাবি, ভাবি...চাপা গলায় সে ডাকতে লাগল বড় ভাবিকে।

রুম থেকে বড় ভাবি স্বাভাবিক ভলিয়ুমে বললেন, কী হয়েছে নাদিম?

নাদিম নিজের ঠোঁটে আঙুল রেখে শ্‌শ্‌শ ধ্বনি করে বলল, ভাবি, টুথপেস্ট শেষ হয়ে গেছে। তোমারটা থেকে একটু ধার দাও না।

বড় ভাবি দাঁড়াও বলে অন্তর্ধান করলেন।

হে আল্লাহ ভাবিকে তাড়াতাড়ি পাঠাও। বাবা দেখে ফেলার আগেই।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই গাড়ি নষ্ট হয়, আর তখনই বাঘের ডাক শোনা যায় হালুম হালুম...'নাদিম, এই, কীরে কী হয়েছে?'

বাবা দেখে ফেলেছেন।

নাদিম স্মার্ট হবার চেষ্টা করে, কিছু না। তুমি পেপার পড়ো।

বাবা হেঁকে চলেন, (হালুম হালুম), এদিকে আয়। নাদিম যেতে চায় না। বাবা গর্জে ওঠেন, (হালুম হালুম) এদিকে আয় বলছি।

নাদিম বাবার ধমকে বিভ্রান্ত হয়ে তার কাছে গেল। টুথপেস্টের খালি টিউব আর ব্রাশ লুকিয়ে পেছন দিকে রেখেছে সে।

বাবা পত্রিকা হাতে ধরে তার দিকে ত্রিশ ডিগ্রি অ্যাংগেলে তাকিয়ে বললেন, কী ?

কিছু না বাবা।

হাতে কী?

বাসায় পরা ট্রাউজারের পেছনে কোমরের কাছে চট করে পেস্ট ব্রাশ গুঁজে রেখে হাত বের করে নাদিম দেখাল, কই হাতে কিছু তো নেই?

আচ্ছা যা।

নাদিম চলে যাচ্ছে। বাবা তার পেছনে পেস্টের টিউব আর ব্রাশ দেখতে পেলেন। আজ পর্যন্ত শকুনের চোখে কোনো মড়া গরু আর বাবার চোখে কোনো গোপনীয় জিনিস কখনও আড়ালে থাকতে পারেনি।

বাবা বললেন, এই হতভাগা। পেছনে কী গুঁজেছিস? এদিকে আয়।

তিনি হাত বাড়িয়ে ব্রাশ আর টিউবটা নিলেন।

নাদিম বিড়ালের মতো মিউ মিউ করতে করতে বলল, টুথপেস্ট শেষ হয়ে গেছে বাবা। তাই...

বাবা বললেন, মাসের কত তারিখ?

১৫।

পেস্ট কত তারিখ পর্যন্ত চলার কথা।

১৯।

৪ দিন আগে পেস্ট শেষ। আমি কি এখানে দানসত্র খুলে বসেছি। পেস্ট শেষ হলো কেন? খেয়েছিস?

হ্যাঁ... না বাবা।

তখন হঠাৎ মেজ ভাইয়ের দরজা খুলে গেল। তার ছেলে চঞ্চল, বয়স ৫, দরজা সামান্য ফাঁক করে দাদা আর ছোট চাচার কথা শুনছিল, মুখ বের করে বলল, জি দাদা ভাই। আপনি রুটির সাথে মাখন খেতে দেন না তো। ছোট চাচা তাই পেস্ট দিয়ে রুটি খেয়ে ফেলেছে। হিহিহি...

আনোয়ার চৌধুরী ধমক দিয়ে উঠলেন, এই।

চঞ্চল সাথে সাথে দরজাটা বন্ধ করে ফেলল।

বাবা নাদিমকে বলেই চলেছেন, তুই বউমার কাছে পেস্ট চাইতে গেছিস। ভিক্ষা?

নাদিম বলল, না বাবা। ধার শোধ চাইতে গিয়েছিলাম। ভাবি গত মাসে আমার কাছ থেকে....

কী? বউমাও তোর মতো নাকি? বাবা টিউবটা নেড়ে দেখেন, এই শয়তানের ভাই, এই টিউব দিয়েই তো আরো তিন দিন চলবে।

চলবে না বাবা। গত ৭ দিন ধরে তো টিপে টিপে আঙুল ব্যথা করে ফেলেছি। দেখেন।

নাদিম টিউব টিপে দেখাল যে আর পেস্ট নেই। কী দেখলে, আর আছে?

বাবা বললেন, যা। একটা কাঁচি আন।

নাদিম ডাইনিং স্পেসের পাশের একটা শোকেসের ওপর থেকে কাঁচি এনে দিল।

সবাইকে ডাক। কায়দাটা সবাইকে দেখাই।

সবাইকে দেখাতে হবে?

হ্যাঁ। ডাক।

নাদিম বড় ভাবির দরজায় নক করে করে বলল, বৈঠকখানায় আসো। বাবা তোমাদের একটা কায়দা শেখাবে।

মেজ ভাবির দরজায় গিয়েও একই হাঁক, সবাই বৈঠকখানায় আসো। বাবা তোমাদের একটা কায়দা শেখাবে।

বড় ভাই, বড় ভাবি, তাদের মেয়ে ম্যাডোনা– বয়স ৬, মেজ ভাই, মেজ ভাবি, তাদের ছেলে চঞ্চল চলে এলো।

বাবা বললেন, শোনো। পেস্টের টিউবে পেস্ট কখনও শেষ হয় না। সেটাই আমি দেখাচ্ছি।

তিনি টিউবের পেছনটা কাঁচি দিয়ে কেটে ব্রাশ ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর ব্রাশ বের করে বললেন, দেখলি, কতটা পেস্ট!

নাদিম বলল, কই নেই তো বাবা।

বাবা বললেন, মুখে ঢোকা হতভাগা। দেখ ঠিকই ফেনা হবে। ঢোকা।

নাদিম টুথব্রাশটা মুখে ঢোকাল। ফেনা হলো ঠিকই।

চঞ্চল বলে উঠল, হাততালি দাও। হাততালি। ভালো ম্যাজিক।

বড় ভাবি হাতে করে একটা টুথপেস্টের টিউব এনেছিলেন। সেটা তিনি লুকিয়ে পেছনে রেখেছিলেন। মুখটা খোলা ছিল। হাতের চাপে পড়ে টিউব থেকে পেস্ট বের হয়ে যাচ্ছে। তিনি ঘুরে তাকিয়ে দেখে প্রমাদ গুনলেন।

ম্যাডোনা বলল, মা, তোমার পেছনে...

বড় ভাবি বললেন, চুপ। চুপ।

চঞ্চল টের পেল সবই। সে বলল, দাদা ভাই। বড় চাচি আপনার চেয়ে ভালো ম্যাজিক জানে। ওনার টিউব থেকে গলগল করে পেস্ট বের হচ্ছে।

বাবা বললেন, বউমা। দেখি। সর্বনাশ! এত বড় অপচয়। আমার বাসায় এত বড় অপচয়। শয়তানের বোন কোথাকার। ওরে এ দৃশ্য দেখার আগে আমার মৃত্যু হলো না কেন।

বাবা শুয়ে পড়লেন। সেটা কি অভিনয়, নাকি সত্যিকারের ব্যথায়, কে জানে। নাদিম তার মাথায় পত্রিকা দিয়ে বাতাস করতে লাগল।

মেজ ভাবি বললেন, বাবা। আপনি মাথা ঠাণ্ডা রাখুন বাবা। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়।

বাবা কাতর কণ্ঠে বললেন, ঠিক। কিন্তু এত বড় বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখিটা কী করে? বউমা। কী করি বলো তো।

মেজ ভাবি বললেন, আপনি ঠিক থাকুন। আমি ব্যবস্থা করছি। চঞ্চল। সবার ব্রাশ নিয়ে আয় তো বাবা। ম্যাডোনা, তুমিও আনো।

দু পিচ্চি সব ব্রাশ আনল। মেজ ভাবি সবগুলো ব্রাশের গায়ে মেঝেতে পড়ে যাওয়া পেস্ট একটু একটু করে লাগালেন।

তারপর বাবাকে সেগুলো দেখিয়ে বললেন, আজ রাতে সবাই এই পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজবে। ঠিক আছে বাবা।

বাবা খুশি হলেন বলেই মনে হলো। তিনি বললেন, মারে। তুমি আছো বলে আমার সংসারটা টিকে আছে। না হলে এই সংসার অপচয়ে অপচয়ে শেষ হয়ে যেত।

## ২

নাদিমের মেজ ভাই নাসির। মেজ ভাইয়ের ঘুম ভাঙতে আজ দেরি হয়ে গেছে। রোজ সকাল ৭টার মধ্যে তিনি উঠে পড়েন। কাল রাতে একটা জরুরি কাজে গিয়েছিলেন কুমিল্লায়। ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে গেছে। শুতে শুতে রাত দুটো। দেরি করে

শোয়ায় ঘুমও আসছিল না। বিছানায় শুয়ে শুয়েই তিনি শুনতে পেয়েছেন ফজরের আজান। বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে তাঁর মনে নানা ভাবনার উদয় হয়েছে। সকাল ৭টার দিকে তার স্ত্রী মলি একবার ডেকেছিল, সে ঘুমের মধ্যেই বলেছিল, খবরদার, আমি এখন উঠতে পারব না।

৯টার পরে আর বিছানায় থাকতে পারলেন না তিনি। উঠে পড়লেন। বাথরুমে গেলেন। হাত-মুখ ধুলেন। নাশতার টেবিলে আসতে আসতে প্রায় ১০টা। ছুটির দিন। কাজের তাড়া নেই। আয়েশি ভঙ্গিতেই বসলেন নাশতার টেবিলে।

দুটো টোস্ট বিস্কুট আর চা তার জন্যে নাশতা হিসেবে বরাদ্দ। বাবার কী যে নিয়ম। ছুটির দিনে সত্যিই সকালটা খুব খারাপ যায়। অন্য দিনে তবু বাইরে গিয়ে নাশতা-টাশতা হোটেল থেকে আনিয়ে সারা যায়। মেজ ভাই হাঁক ছাড়লেন, কই গো শুনেছ নাশতা দাও।

মেজ ভাবি এসে কৌটা থেকে দুটো টোস্ট বিস্কুট বের করে পিরিচে রাখলেন।

মেজ ভাই নাক কুঁচকে বলল, শুধু টোস্ট বিস্কুট?

তার স্ত্রী জবাব দিল, না সঙ্গে চা আছে।

'বাবা যে এই সম্পত্তি দিয়ে কী করবে আল্লাহ জানে।'

বাবা পত্রিকা থেকে মুখ না তুলেই বললেন, এই শয়তানের ভাই, দশটার সময় যে নাশতা পাচ্ছিস, এই তো বেশি।

মেজ ভাই ফিসফিসিয়ে বউকে বললেন, দেখেছ। শুনে ফেলেছে।

এত আস্তে তিনি বললেন যে বাবার কান পর্যন্ত পৌছানোর কথা নয়। কিন্তু তারপরেও বাবা শুনে ফেললেন, এই কী শুনে ফেলেছি।

মেজ ভাই বউয়ের মুখের দিকে তাকালেন ধরা পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে। তার দৃষ্টি যেন বলছে, দেখলে, এই কথাটা পর্যন্ত কানে গেছে। কথা বলাই মুশকিল।

ভাবি কাপে গরম পানি ঢাললেন। শোকেসের কাচ সরিয়ে সেখান থেকে বের করল একটা নতুন টি-ব্যাগ। সে টি-ব্যাগটা কাপের গরম পানিতে বিসর্জন দিতে যাচ্ছে, এমন সময় বাবা দৌড়ে এলেন। 'বউমা, বউমা কী করছ? মেজ বউমা তুমিও?'

মেজ ভাবি প্রথমে বুঝতে পারেন নি ঘটনাটা। তিনি বললেন, জি বাবা? কোনো ভুল হয়ে গেল?

বাবা আর্তনাদের সুরে বললেন, ভুল মানে! সর্বনাশ! সকালে না দুটো টি-ব্যাগ বের করেছ। চা হয়েছে ৫ কাপ। আরো মিনিমাম ৩ কাপ চা হতে পারে।

ভাবি বললেন, স্যরি। ভুল হয়ে গেছে।

বাবা বললেন, ওই টি-ব্যাগগুলো কই।

ভাবি বললেন, সিংকে আছে মনে হয়।

মেজ ভাই বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললেন, বাবা সে তো বাসি হয়ে গেছে।

বাবা টিটকারির সুরে জবাব দিলেন, সেটা কি আমার দোষ? ঘুম থেকে তুই দেরি করে উঠেছিস কেন? বউমা, যাও নিয়ে এসো।

ভাবি সিংকে গেলেন। সেখানে আধোয়া ৫টা কাপ, পিরিচ এলোমেলো করে রাখা। দুটো ভেজা টি-ব্যাগ পিরিচে রয়ে গেছে। একটা টি-ব্যাগ তিনি তুলে আনলেন শাড়ির আঁচলে নাক চেপে ধরে।

বাবা বললেন, দাও আমাকে দাও।

ভাবি সেটা তার হাতে দিলে তিনি ভেজা টি-ব্যাগটা নিয়ে এক কাপ গরম পানিতে ছেড়ে দিয়ে নাড়তে লাগলেন। পানিতে লিকার ছড়াতে লাগল। তিনি সেদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, দেখলে, কতটা লিকার এখনও আছে। নাসিরের দিকে বাবা কাপটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, নে খা। চায়ে বিস্কুট ভিজিয়ে ভিজিয়ে খা।

এই চা তাকে খেতে হবে? এই ফেলে দেওয়া পুরোনো টি-ব্যাগের চা? মেজ ভাইয়ের ভারি কান্না পাচ্ছে। তিনি বললেন, না বাবা। থাক। চা না খাওয়া প্রাকটিস করি। আপনার পয়সা বাঁচবে।

বাবা বললেন, তাহলে এই চা এখন কে খাবে? অপচয় করাটা ঠিক হবে না।

মেজ ভাই বললেন, বাবা তুমি খাও।

এই কথোপকথন আরো কত দূর চলত, কে জানে।

টুংটাং।

ডোরবেল বেজে উঠল।

মেজ ভাই তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুললেন। দেখতে পেলেন আপা আর দুলাভাই দরজায় দাঁড়িয়ে।

তিনি সহাস্যে তাদের সম্ভাষণ জানালেন, আসেন আসেন দুলাভাই। আপা কেমন আছ?

আপা গা ছেড়ে দেওয়া ভঙ্গিতে বললেন, আছি। মেজ ভাই তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বাপ রে বাপ, এই চা খেতে হলে তিনি বমি-টমি করে দিতেন!

আপা-দুলাভাই ভেতরে ঢুকলেন। আপার বয়স ৩৬, দুলাভাইয়ের ৪২ মতোন হবে। তবে আপা সেলোয়ার-কামিজ পরা।

আপা বললেন, বাবা, আপনার শরীর ভালো?

বাবা জবাব দিলেন, ভালো।

দুলাভাই ফোঁড়ন কাটলেন, থাকারই কথা। এত নিয়ম মেনে খেলে চললে পায়ে হেঁটে চলাচল করলে শরীর ঠিক না থেকেই পারে না।

আপা ধমকের সুরে বললেন, তুমি বেশি কথা বলো না তো।

বাবা বললেন, জামাই বাবাজি। বাসায় নাশতা করে এসেছ তো?

দুলাভাই হেসে জবাব দিলেন, জি বাবা। আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নাই।

বাবা বললেন, এক কাপ চা খাও অন্তত।

দুলাভাই হাত কচলে বললেন, কী দরকার ছিল?

বাবা হেসে বললেন, খাও আমি নিজে বানিয়েছি।

দুলাভাই সম্মতি দিলেন, খাই তাহলে!

বাবা ইঙ্গিত করলে মল্লি দুলাভাইকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল।

দুলাভাই চায়ের কাপে চুমুক দিলেন স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই।

বাবা বললেন, কেমন হয়েছে?

দুলাভাই হেসে বললেন, ফার্স্টক্লাস। তবে আজকালকার চিনিতে আবার মিষ্টি হয় কম। মিষ্টি কম হয়েছে।

বাবা বললেন, চিনি দেওয়া হয়নি। চায়ে মিষ্টি উইরোপ-আমেরিকায় কেউ খায় না।

দুলাভাই বললেন, ও। তিনি অতিকষ্টে চা খাচ্ছেন। তার মুখের চেহারা দেখলে মনে হবে তিনি চিরতা পাতার রস খাচ্ছেন।

এই সময় ৫ বছরের দুষ্টকুল-শিরোমণি চঞ্চলের ঘটনাস্থলে আগমন।

চঞ্চল বলল, ফুপা, ফুপা। এই চা খাচ্ছেন। দাদা ভাই ওই এঁটো কাপ-পিরিচ থেকে সকালের টি-ব্যাগ তুলে এনে এটা বানিয়েছেন।

বলিস কী? দুলাভাই মুখের চা স্প্রের মতো করে ছিটালেন। লাগল গিয়ে নিজের শার্টে। শার্ট নষ্ট হয়ে গেল।

বাবা বললেন, তুমি এটা কী করলে? কাপড় নষ্ট করলে! ওরে চায়ের দাগ তো উঠতে চায় না। কী সর্বনাশ হয়ে গেল রে! খোলো খোলো। এটা এখনই ভিজিয়ে দিতে হবে।

দুলাভাই শার্ট খুলে দিলেন। বড় ভাবি বকুল দৌড়ে এল। কী হয়েছে বাবা?

বাবা বললেন, এই গর্দভ জামাই দেখো শার্ট নষ্ট করল।

বড় ভাবি বিস্মিত—তাতে আপনার সর্বনাশটা কোথায়?

বাবা বললেন, আমার পানি নষ্ট হবে না? ওয়াসা পানির দাম বাড়িয়েছে, জানো না। দৌড়ে বাথরুমে এটা ভিজিয়ে দাও তো। শোনো। পানি বেশি অপচয় করবে না।

বড় ভাবি শার্টটা নিয়ে বাথরুমের দিকে রওনা হলেন।

বাবা তখনও বিড়বিড় করছেন, শয়তানের ভাই। চারদিকে শয়তানের ভাই।

দুলাভাই আর কী করবেন। খালি গায়ে বসে পত্রিকা হাতে নিলেন। পড়ার জন্যে। খবরগুলোর দিকে তাকিয়ে তার কাছে সব চেনা চেনা মনে হতে লাগল। তিনি বিড়বিড় করে উঠলেন, কবেকার পেপার রে। এ তো দুই দিনের বাসি কাগজ।

বাবা জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, তাতে কী? খবরগুলো মিথ্যা হয়ে গেল?

টুংটাং।

ডোরবেল বেজে উঠল আবার। বাবা উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। একটা ছেলে একটা পত্রিকা দিল। বাবা সেটা নিয়ে ঘরে গেলেন। জামাই বাবাজি, নাও তোমার গরম পেপার। দাও, ওটা দিয়ে দিতে হবে।

দুলাভাই হাতের কাগজটা দিয়ে দিলেন। নতুন কাগজ নিলেন। বাবা বাইরের ছেলেটাকে পুরোনো কাগজ অর্পণ করলেন। তারপর ফিরে এলেন ঘরে।

দুলাভাই পত্রিকা পড়তে গিয়ে হোঁচট খেলেন। বাবা এটাও তো মনে হচ্ছে বাসী

কাগজ।

তিনি কাগজের মাথায় ছাপানো তারিখ দেখে নিয়ে বললেন, ঠিকই। কালকের কাগজ।

বাবা বললেন, কালকেরটা পড়লে অসুবিধা কী? কালকের সব খবর কি তোমার মুখস্থ হয়ে গেছে। দাও দেখি পড়া ধরি?

দুলাভাই এক গেলাস পানি হাতে নিয়ে বললেন, না তা হয় নাই।

তিনি গেলাস মুখে তুলে নিয়ে পানি খাচ্ছেন।

বাবা বললেন, তাহলে! আমি নিচের বাসার সাথে কন্ট্রাক্ট করেছি। ওরা ওদের আগের দিনের কাগজটা রোজ দিয়ে যায়। মাস শেষে এ জন্যে ওদেরকে আমি ২০ টাকা দেই। নতুন কাগজ কিনলে খরচ পড়ত ২৪০ টাকা। পুরো ২২০ টাকা সেইফ। কেমন হলো?

দুলাভাই বিষম খেলেন। তার হাত থেকে ছিটকে গেলাসের পানি পড়ে গেল পত্রিকায়। পত্রিকা গেল ভিজে।

বাবা বুঝি মরেই যান। এমন অলক্ষী তো আমি জীবনে দেখি নাই। দিলে আমার পেপার নষ্ট করে। আমি ওদেরকে কাল ফেরত দেব কী?

তিনি পেপার তুলে নিয়ে ফুঁ দিতে লাগলেন।

চঞ্চল হঠাৎ উদিত হয়ে বলল, দাদা ভাই। খুব গরম খবর নাকি? ফুঁ দিয়ে পড়তে হচ্ছে।

বাবা ক্ষিপ্ত, চোপ।

চঞ্চল পালিয়ে গেল।

বাবা বকে যেতে লাগলেন, আর শোনো জামাই। আমার বাসায় এলে লক্ষী হয়ে থাকতে হবে। না হলে আসবে না।

এই সময় বৈঠকখানায় আপার আগমন। বরকে প্রায় নগ্নশরীরে দেখে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, ও গো তোমার কী হয়েছে, তুমি খালি গা কেন? বাবা তোমাকে বকছেন কেন?

বাবা বললেন, দেখ। তোর জামাই আমার পেপার নষ্ট করেছে।

আপা বললেন, বাবা। আপনার মাথাটা তো দেখছি পুরোটাই খারাপ হয়ে গেছে। মা মারা যাবার পরে... দেখারও কেউ নাই... ওগো চলো এ বাসায় আর কোনোদিনও আসব না...

দুলাভাই বিপন্ন ভঙ্গিতে বললেন, খালি গায়ে?

আপা গলার স্বর চড়িয়ে বললেন, নাদির নাদির একটা শার্ট ধার দে তো...

বাবা বললেন, ফেরত দিতে হবে কিন্তু...

বড় ভাই নাদির তার একটা শার্ট নিয়ে এলেন এই ঘরে।

বাবা আবার বললেন, ফেরত দিতে হবে কিন্তু...

দুলাভাই শার্টটা গায়ে চড়াতে চড়াতে বললেন, দেব। অবশ্যই দেব। শার্টটা পার্সেল করে পাঠিয়ে দেব। তারপর দরজার কাছে গিয়ে বাবাকে শুনিয়ে বললেন, আর কোনোদিনও এ বাসায় আসব না। দুলাভাই বেরিয়ে গেছে দেখে বাবা গলা উঁচিয়ে ডাকলেন বড় ভাইকে, নাদির নাদির।

বড় ভাই এগিয়ে এলেন, জি বাবা।

তুই যে গাধাটাকে শার্টটা দিলি ও যদি আর ফেরত না দেয়।

দেবে বাবা!

যদি না দেয়?

তাহলেই তো আর শার্টটা অপচয় হয়ে গেল না বাবা। আমাদের বোনের জামাইই তো পরবে।

না না। আমি তোকে আর শার্ট কিনে দিতে পারব না।

টুংটাং। আবার ডোরবেল বাজল। নাদির দরজা খুলল।

দুলাভাই আর আপা ফিরে এসেছেন।

দুলাভাইয়ের শার্টটা পুরোটা লাল রঙে রঞ্জিত।

বড় ভাই আঁতকে উঠলেন, সর্বনাশ। শার্টে রক্ত লাগল কীভাবে? দুলাভাই আপনার কী হয়েছে?

বাবা বলে উঠলেন, এই শার্টের কী হলো? রক্তের দাগ তো ওঠে না।

দুলাভাই বললেন, বাংলাদেশের মানুষের সিভিক সেন্স হলো না। রাস্তায় বেরিয়েছি। আর কে যেন বাড়ির ছাদ থেকে পানের পিক ফেলল। নতুন শার্টটা নষ্ট হয়ে গেল একেবারে ।

এত বড় একটা আঘাত বাবা সহ্য করেন কীভাবে! তিনি বুকে হাত দিয়ে কাতরাতে শুরু করলেন। তার বুকের ভেতরটা যেন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। বড় ভাই নাদির তাড়াতাড়ি বাবাকে বাতাস করতে আরম্ভ করলেন খবরের কাগজ দিয়ে। বাবা সোফায় কাত হয়ে শুয়ে আহ, উহ করছেন। তার কপালে ঘাম। হবারই কথা। নতুন একটা শার্ট পানের পিক লেগে...

বড় ভাই কী করবেন, বুঝছেন না। বাবার অবস্থা কি সত্যিই গুরুতর! ডাক্তার ডাকতে হবে নাকি! ডাক্তার ডাকলে আবার ডাক্তারের ফির কথা ভেবে বাবার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাতে হিতে বিপরীত হবে! অনেক সময় অবশ্য এই ধরনের কেসে বাবাকে ডাক্তার ডাকার কথা বললে কাজ হয়। বাবা এমনিতেই সেরে ওঠেন। কী করা উচিত, এই যখন ভাবছেন বড় ভাই, তখন বাবা বলে উঠলেন, নাদির, দেখিস, আস্তে বাতাস কর। খবরের কাগজটা আবার তুই নষ্ট করিস না। ওটা কিন্তু ফেরত দিতে হবে।

৩

নাদিমের বাবার পুঁটি মাছ কেনার ঘটনাটা গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে ওঠার মতো। আসলে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে এ রকম কত ঘটনাই না ঘটে, যেটা পৃথিবীর রেকর্ডের ইতিহাসে লিখে রাখবার মতো। শুধু প্রচারের অভাবে এসব বিশ্ববাসীর চোখের আড়ালে রয়ে যাচ্ছে।

সেদিন সকালবেলা। বাসার গেটে সিঁড়ির কাছে মাছওয়ালা এসেছে। রুই বা কৈ বা ইলিশ মাছ নাদিমের বাবা আনোয়ার চৌধুরী কিনেছেন, এ অপবাদ তাকে দেওয়া যাবে না। তবে হ্যাঁ, সেদিন মর্নিং ওয়াক সেরে ফেরার সময় বাসার গেটে যখন এক মাছওয়ালা পুঁটি মাছ পুঁটি মাছ বলে হেঁকে উঠল, আনোয়ার চৌধুরীর মতিভ্রম হলো। তিনি মাছওয়ালাকে বলে ফেললেন, এই দেখি কী মাছ?

মাছওয়ালা ভাগা দিয়েই রেখেছিল, বের করে দেখাল।

বাবা গম্ভীর স্বরে বললেন, এই এক ভাগের দাম কত?

মাছওয়ালা চিকন গলায় বলল, তিরিশ টাকা।

বাপ রে। মাছ খাওয়াই ভুলে যেতে হবে। তিরিশ টাকা পুঁটি মাছ। দিবা কত?

২৮ টাকা দেন।

১৫ টাকা।

১৫ টাকায় মাছ খাওন যায় না।

১৫ টাকাতে মাছই খাব।

মাছিও ১৫ টাকায় হয় না। ২৫ টাকায় নিছেন?

গোনো তো কয়টা?

২০ টা।

বাড়িতে আমার ৮ জন মানুষ। ২০ টা মাছ কেন নেব? ১৬ টা দাও। ২০ টাকা দেব।

লন। সবটাই ২০ টাকা।

নানা তুমি ১৬ টা দাও। ১৬ টাকা পাবে। তোমার হিসাবেই হলো। আচ্ছা আমি না হয় একটাই খাব। ১৫ টা দাও। ১৫ টাকা।

মাছওয়ালা মাছ কটা তুলে দিল নেটের ব্যাগে। বাবা পকেট থেকে বের করে একটা ১০ টাকার নোট আরেকটা ৫ টাকার নোট দিলেন তাকে।

মাছওয়ালা হাসি হাসি মুখ করে বলল, ভালোই হইল। বউনি হইল।

বাবা আরো ভারিক্কি গলায় বললেন, শোনো ১৫ টাকায় মাছ কিনলাম না মাছি কিনলাম? শোনো, এরপর থেকে কথা কম বলবা।

মেজ ভাই নাসির  আর মেজ ভাবি মলির ঘর। সেই ঘরে এই দম্পতি গুজুর গুজুর ফিসির ফিসির করছে। বিষয় : বাবার কিপ্টেমি। তাদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে

ঈষৎ বিদ্রোহের আঁচ ও ঝাঁজ।

মেজ ভাই বললেন, বাবার এই কিপ্টেমির বাড়াবাড়ি আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি আমি... আই মাস্ট রিভোল্ট...

মেজ ভাবি বললেন, শোনো। বাবার এই যে বড় বাসা, তিন জায়গার তিন ব্যবসা, এত এত টাকা, এসব তো নষ্ট হচ্ছে না। থাকলে তো এসব তোমরাই পাবে। নাকি?

তা অবশ্য ঠিক। বেশি উদারতা ভালো না। তবে এত কিপ্টেমি কি ভালো? আরেকটু ছাড় দিলে কী হয় বাবা?

আহা, বাবা কি আগে এরকম ছিলেন নাকি? মা মারা যাবার পরই তো আস্তে আস্তে তার মাথাটা একটু বিগড়ে গেল।

একটু না। বেশ। বলা যায় উনি একটা মাঝারি ধরনের পাগল।

হঠাৎ খাটের পাশ থেকে মেজ ভাই আর মেজ ভাবির সুযোগ্য সন্তান, নাদিমের ভ্রাতুষ্পুত্র চঞ্চলের আবির্ভাব। বিনামেঘে বজ্রপাতের মতন।

চঞ্চল বলল, বাবা, দাদা ভাইকে তুমি পাগল বলেছ। আমি দাদা ভাইকে বলে দেব।

মেজ ভাই বললেন, বল, বললে তোর কান আমি ছিঁড়ে ফেলব।

আমি এটাও বলব। কান ছিঁড়তে দাদা ভাই দেবে না।

মেজ ভাই আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বললেন, বলিস না বাবা। তোর পায়ে ধরি।

চঞ্চল বলল, তাহলে আমাকে ১৫টা টাকা দাও। আমি চকলেট খাব।

মেজ ভাই বললেন, এত টাকা আমি কোথায় পাব?

চঞ্চল বলল, বাবা তুমি দাদা ভাইয়ের মতো কিপ্টেমি করছ কেন? ঠিক আছে। করো। আমি বলব দাদা ভাইকে তুমি পাগল বলেছ।

মেজ ভাই বললেন, আয় এদিকে আয়। নে টাকা নে।

ওদিকে বড় ভাই আর বড় ভাবি তাদের ঘরে। আর আছে তাদের মেয়ে ম্যাডোনা।

বড় ভাই বললেন, খুব খিদা লেগেছে। ওগো, তোমার স্টক থেকে একটা কিছু খেতে দাও না।

বড় ভাবি বললেন, দাঁড়াও।

তিনি স্টিলের আলমারি খুলে বিস্কুটের একটা টিন বের করলেন। এটা তার দুর্দিনের সম্বল। তিনি বিস্কুট বের করে স্বামীকে দিলেন, নিজের জন্যে একটা রাখলেন, আর মেয়ের হাতে একটা দিয়ে বললেন, ম্যাডোনা, নে খা। শোন, বাসার কাউকে কিন্তু বলিস না, আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে খাই। ওরা খুব মন খারাপ করবে।

ম্যাডোনা বলল, কেন মা। মন খারাপ করবে কেন?

বড় ভাবি বললেন, আমরা খরচ করি শুনলে দাদাভাই হার্টফেল করে মরেই যাবেন।

ম্যাডোনা ব্যাপারটা বুঝল, বলল, তাহলে তো কাউকে বলা যাবে না।

দরজায় ঠকঠক হচ্ছে।

ব্যাপার কী? কে এলো এই সময়ে। বেচারারা বিস্কুট কই লুকাবে, টিন কই লুকাবে, মহাবিব্রতকর অবস্থা!

বড় ভাবি আস্তে করে বললেন, কে?

মেজ ভাইয়ের গলা ভেসে এলো, ভাবি ভাবি, দরজাটা একটু খুলবে?

তিনজন তিনটা বিস্কুট মুখে পুরে আছে, মেজ ভাই দরজা খুলে উঁকি দিলেন। বললেন, ভাইজান, বাবার বাড়াবড়ি আমার ভালো লাগছে না। বাবাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখালে হয় না?

তিনজনই মাথা নাড়ছে। কিন্তু মুখে কিছু বলছে না। মেজ ভাই ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

ঠিক তারই পিছে পিছে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়ে বিড়ালের মতো করে এসে দাঁড়িয়েছেন বাংলার শেষ বাঘ বাবা অর্থাৎ আনোয়ার চৌধুরী।

মেজ ভাই বলে চলেছেন, এই কী বলি শুনেছ? বাবার কিপ্টেমিটা আর নরমাল পর্যায়ে নাই। পাগলামির পর্যায়ে গেছে। তাকে একজন ভালো ডাক্তার দেখাতে হয়। কী বলো?

বড় ভাই মাথা নাড়েন, কথা বলেন না। মাথা নেড়ে না বললেন। কারণ তিনি পেছনে বাবাকে দেখেছেন। ভাবিও। ম্যাডোনাও।

মেজ ভাই বললেন, কী ব্যাপার, তোমরা মাথা নাড়ছ কেন? তোমাদেরকেও কি সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হবে নাকি?

বড় ভাই মাথা নেড়ে জানালেন, না।

মেজ ভাই হাত বাড়িয়ে ম্যাডোনাকে ধরে বললেন, এই তোরা মুখ খুলছিস না কেন?

ম্যাডোনাকে টেনে ধরে মুখ থেকে বিস্কুট বের করে বললেন, ও বিস্কুট খাচ্ছিস?

ম্যাডোনা জিভ কামড়ে বলল, এই আল্লাহ, চাচা তুমি কী করলে?

মেজ ভাই বললেন, কেন?

ম্যাডোনা বলল, আমাদের বিস্কুট খাওয়া দেখলে দাদা ভাই হার্টফেইল করে মরে যাবেন। না দাদাভাই?

মেজ ভাই তাকিয়ে দেখলেন, পেছনে বাবা। সর্বনাশ! তিনি তোতলাতে তোতলাতে বললেন, বাবা তুমি কখন এলে?

বাবা তৎক্ষণাৎ সামনে রাখা একটা ইজি চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়লেন। তাঁর মাথা পড়ল এলিয়ে। তাঁর কপালে ঘাম। তিনি বুকে হাত দিয়ে আহ উহ করছেন। মনে হচ্ছে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা। অরিজিনাল ব্যথা নাকি এটা তার মনের অসুখ, কে জানে! হাতের কাছে যিনি যা পেলেন, তাই নিয়ে সবাই তার মাথায় বাতাস করতে লাগলেন। একজন গিয়ে ফ্যান ছেড়ে দিলেন তড়িঘড়ি। ফ্যান ঘুরতে লাগল।

বাবা চোখ মেললেন, এই শীতের দিনে ফ্যান কেন? ইলেক্ট্রিক বিল কত আসছে, তুই জানিস?

ওদিকে ম্যাডোনা চলে গেছে চঞ্চলের কাছে। চঞ্চলকে সে বলছে, দাদ ভাইয়ের হার্ট ফেইল করেছে। উনি মারা যাচ্ছেন।

কে বলল?

ম্যাডোনা বলল, হ্যাঁ। আমার লুকিয়ে লুকিয়ে বিস্কুট খাচ্ছিলাম। উনি দেখে ফেলেছেন তো।

চঞ্চল বলল, লুকিয়ে বিস্কুট খেলে কী হয়?

আরে লুকিয়ে বিস্কুট খেলে হয় না। বিস্কুট খাওয়া দেখে ফেললে হয়। দাদা ভাই ভীষণ কিপ্টে না?

নাদিমের এখন একটা জরুরি ফোন করা দরকার। সিমিকে। কিন্তু ফোনে তালা দেওয়া। আর চাবি বাবার কাছে। এই চাবি আদায় করা খুবই কঠিন ব্যাপার। সত্য কথা বললে বাবা জীবনেও চাবি দেবেন না। মিথ্যা কথাই বলতে হবে। কী আর করা। জীবনের সর্বত্র সত্যবাদী হলে চলে না।

সে বাবার কাছে গেল।

বাবা, একটু ফোনের চাবিটা দেবেন?

কেন, ফোনের চাবি কেন? গত মাসে ৩৩০ টাকা বিল এসেছে।

খুব জরুরি বাবা।

খুব জরুরিটা কী?

আমাদের এক বন্ধুর অসুখ। রক্ত লাগবে। রক্ত পাওয়া গেছে। এখন ফোনে বলে দিলে ওরা দৌড়ে গিয়ে রক্ত নিয়ে আসবে।

কোথায় বলতে হবে। আমাকে ঠিকানা বল, আমি হাঁটতে হাঁটতে খবরটা দিয়ে আসি। তোর বন্ধুকে দেখেও আসি।

নাদিম পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে বাবার হাতে দিয়ে বলল, বাবা এই নাও তোমার ১ টাকা ৮০ পয়সা, ২০ পয়সা অতিরিক্ত দিলাম। তবু ফোনটা করতে দাও।

তুই টাকা পেলি কোথায়?

আমাদের ওই ব্লাড ফান্ডের।

ঠিক আছে কর ফোন।

বাবা তার পকেট থেকে ফোনের চাবিটা বের করে দিলেন।

তারপর ড্রয়ার খুলে দুই টাকা রাখলেন। আর ২০ পয়সা খুচরো বের করে ফেরত দিলেন নাদিমের হাতে। বললেন, নে তোর বিশ পয়সা। ব্লাড ফান্ডের পয়সা আমি বেশি নিতে পারি না।

তারপরে বের করলেন তার হিসাব লেখার খাতা। পেন্সিলটা একটা সুতো দিয়ে বাঁধা ছিল খাতার সঙ্গে। আধখানা হলদে রঙের পেন্সিল। তাই দিয়ে তিনি লিখলেন : জমা ২ টাকা (নাদিম, ফোন কল বাবদ), ফেরত ২০ পয়সা।

নাদিম চাবি নিয়ে গেল ফোনের কাছে। তালা খুলল।

বাবা দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন।

নাদিম ডায়াল করল। সিমির মোবাইলে। রিং হচ্ছে।

হ্যালো, সিমির গলা।

নাদিম বলল, হ্যালো। শোন্, আমি নাদিম।

সিমি বলল, বল্।

বাবার দয়ায় ফোন করছি। ব্লাডের কথা শুনে বাবা ফোন করতে দিতে রাজি হলো। তাই না বাবা?

কী পাগলের মতো কথা বলছিস!

ব্লাড পাওয়া গেছে। তোরা কোথায়? আমি আসছি।

ব্লাড দিয়ে আমরা কী করব?

তোরা কোথায়?

শাহবাগে। চলে আয়।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি আসছি।

রমনা মানে রমনা রেস্তরাঁ। ওখানেই তার বন্ধুদের আড্ডা দেবার কথা। তারা যারা একসঙ্গে মাস্টার্স করেছে। কেউ চাকরি খুঁজছে, কেউ ব্যবসার ধান্দা করছে, কেউ বা এমফিল করছে। কেউ কবিতা লেখে, কেউ গান গায়। এত কিছু করা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটা বেকার বেকার ভাবও আছে।

শাহবাগে আজিজ সুপার মার্কেটের সিঁড়িতে সব বসে আছে।

নাদিম গিয়ে সেই দলে যোগ দিল।

সিমি আজ পরেছে একটা বিস্কিট রঙের শার্ট আর কালো রঙের প্যান্ট। নাদিমের মনে হলো, আসলে পশ্চিমা পোশাকেই সিমিকে সুন্দর লাগে।

সিমি বলল, এই নাদিম, কী সব ব্লাড ট্লাড বলছিলি, আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

নাদিম বলল, তোকে ভয় পাওয়ানোর জন্যেই বলেছিলাম।

এ কথা সে কথার পরে সিমি বলল, আমার এখন খুব স্যুপ খেতে ইচ্ছা করছে। কে আমাকে খাওয়াবে?

সাগর বলল, নাদিমদের কত বড় বাড়ি। কত সম্পত্তি। নাদিমই খাওয়াক।

নাদিম বলল, আমি? দাঁড়া দেখি, আমার পকেটে কত টাকা আছে। এ খোদা আমার মানিব্যাগটা তো দেখছি না। কখন পকেট মার হয়ে গেল নাকি?

পাভেল বলল, সিমি খেতে চেয়েছে। আমি খাওয়াব।

সিমি বলল, তোকে খাওয়াতে হবে না। আমি নাদিমকে ধার দিচ্ছি।

পাভেল বলল, সিমি বুঝে-শুনে দিস। নাদিম কোনোদিনও এক পয়সা খরচ করে না। ও তোর ধার শোধ করবে না।

সিমি বলল, দেখি আমারটা করে কিনা।

নাদিম বলল, না রে ভাই। ঋণ করে ঘি খেতে আমি পারব না। পাভেলই খাওয়াক।

সিমি বলল, তাহলে পাভেল চল, তুই আর আমিই গিয়ে খাই। এ কিপ্টেগুলোকে আর সাথে নেব না। চল তাহলে এখানে না। অন্য রেস্টুরেন্টে যাই।

পাভেল বলল, ঠিক আছে। চল। এই রিকশা, এই যাবেন নাকি, এই তো হোয়াংহোতে...

সিমি আর পাভেল রিকশায় উঠে চলে গেল।

কেমন লাগে?

সখি কেমনে ধরিব হিয়া, আমার বধূয়া আর বাড়ি যায় আমার আঙিনা দিয়া। নাদিমের মনটা খুবই দমে গেল।

একজন তার অবস্থা দেখে গান ধরল, ফাইটা যায় বুকটা ফাইটা যায়, বন্ধু যখন রিকশা নিয়া আমার চোখের সামনে দিয়া অন্য লোকের পাশে বইসা কাইটা যায়...

দীর্ঘশ্বাস গোপন করে নাদিম বলল সাগরকে, আমার বাবাটার জন্যে এ জীবনে কিছুই হবে না। টাকাও দেবে না। আবার টিউশনিও করতে দেবে না। বলে টাকার তো আমাদের অভাব নাই। টিউশনি করবা কেন? বোঝ।

## ৪

আনোয়ার চৌধুরী তাঁর ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়বেন বলে হাতে নিয়েছেন। হঠাৎ তার চোখ পড়ল কাগজটার প্রধান শিরোনামের দিকে।

৫ মে পৃথিবী কি ধ্বংস হয়ে যাবে?

লাল কালিতে কাগজের এ পাশ থেকে ও পাশ পর্যন্ত একটাই খবর।

তিনি মন দিয়ে পড়তে শুরু করলেন :

বিশেষ প্রতিবেদক : আগামী ৫ মে সৌরজগতে এক প্রলয়ঙ্করী কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। শুক্র শনি বৃহস্পতি মঙ্গল সব এক রেখায় এসে পৃথিবীর কাছে চলে আসবে। মহাজগতের লক্ষ কোটি বছরের ইতিহাসে এই ঘটনা আর ঘটে নি। এর ফলে পৃথিবী কক্ষচ্যুত হয়ে ছুটে যেতে পারে বৃহস্পতির দিকে। তাহলেই ঘটে যাবে মহাপ্রলয়। বৃহস্পতির গায়ে আছড়ে পড়ার আগেই জ্বলে পুড়ে নিঃশেষিত হয়ে যাবে পৃথিবীর গাছপালা নদী পাহাড়পর্বত সব প্রাণী।

কাজেই ৪ মেই হলো পৃথিবীর শেষ দিন। এমনি মত প্রকাশ করেছে আমেরিকার ডেনভারের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাইকেল কলিন্স। এ বিষয়ে একটি ওয়েবসাইটও খোলা হয়েছে।

তবে নাসার বিজ্ঞানীরা ৫ মে'কে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের জন্যে একটা কৌতূহল-উদ্দীপক দিন বলে বর্ণনা করে কোনো প্রকার বিপর্যয়ের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন।

এদিকে ৫ মে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে জেনে আমেরিকায় মানুষের মধ্যে ব্যাপক ভয়-ভীতি শংকা দেখা দিয়েছে। গির্জাগুলোতে এখন বেড়ে গেছে ভিড়। সবাই যাজকদের কাছে পাপ স্বীকার করে নিয়ে ক্ষমা চাইছে ঈশ্বরের কাছে। অনেকেই প্রিয়জনদের সঙ্গে একত্রে মৃত্যুকে মোকাবেলা করার জন্যে ছুটি নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটছে।

বাবা খবরটা দুইবার পড়লেন। আগামী ৫ মে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে? আর মাত্র অল্প কটা দিন পরে? তারপর আমি আর থাকব না? আমি না থাকি, এই বাড়ি আর থাকবে না? আমার ছেলেমেয়েরা আর থাকবে না? নাতি-নাতনিরা? বলে কী? মা আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল সকলি ফুরায়ে যায় মা!

তবে কাগজে কি ঠিক কথা লিখেছে?

মনে হয় ভুল!

আচ্ছা এটা তো কালকের কাগজ। আজকের কাগজটা এনে দেখা দরকার।

বাসায় কোনো চাকর-বাকর নেই যে তাকে দিয়ে নতুন একটা কাগজ আনানো যায়।

উপরের তলায় গিয়েই পড়ে আসতে হবে। আর ওপর তলায় গেলে ওরা কি এক কাপ চা খাওয়াবে না। দুটোই সারা যাবে।

বাবা বের হলেন। উপরের তলায় গেলেন। ডোরবেল টিপলেন।

দরজা খুলছে না। তিনি পায়ের পাওয়াজ পাচ্ছেন।

কে যেন এসে ম্যাজিক হোল দিয়ে দেখছে।

কে রে? মহিলা কণ্ঠ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল।

ওই যে নিচতলার কিপ্টে বুড়োটা। কাজের মেয়ে ধরনের কণ্ঠে উত্তর এলো। কী রকম লাগে? এই বাসায় ঢোকাটা কি তার উচিত হবে? তার চেয়ে বরং বাইরে গিয়ে রাস্তার কাগজ দেখে এলেই হয়। তা হয়, কিন্তু এক কাপ চায়ের সম্ভাবনাটা!

এই সময় গেট খুলে গেল। দরজা খুললেন বাড়ির গৃহিণী।

আসসালামু আলায়কুম।

ওয়ালাইকুম। আপনাদের দেখতে এলাম। কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো!

না না। আসুন ভেতরে আসুন।

এই তো চাই। নাদিমের বাবা ভেতরে ঢুকলেন। বসতে বসতে বললেন, একই বিল্ডিঙের ওপরে-নিচে থাকি, অথচ কথা হয় না। তাই এলাম।

জি ভালো করেছেন। ওর বাবা তো অফিসে গেছে।

ও।

আপনি একটু বসেন। আমি চা করে আনছি।

চা? না কী দরকার ছিল?

দরকার নাই বলছেন?

না এত করে যখন বলছেন। তা চা আনার ফাঁকে আমি একটু পত্রিকা পড়ি। আজকের কাগজটা কোথায়?

ভদ্রমহিলা আজকের পত্রিকাটা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ওরে বাবা। আজকের কাগজে তো আরো ভয়াবহ করে ছাপা হয়েছে খবরটা। ৫ মে-ই রোজ কেয়ামত। মহাপ্রলয়। সারা পৃথিবীতে নাকি মানুষ জেনে গেছে আর সময় নাই। দুনিয়া আর মাত্র দুই দিনের। মানুষ সব তওবা করছে। কেউ বা যতটুকুন পারা যায় ফুর্তি করে নিচ্ছে। এলাকায় এলাকায় বিয়ের ধুম পড়ে গেছে। মরার আগে বিয়ের সাধটা কে আর অপূর্ণ রাখতে চায়।

না। আর বাঁচা হলো না। চা এসে গেছে। দুটো চকোলেট বিস্কুট। দু দুটো। ফ্রি!

মনে হয় দুনিয়াটা আর টিকল না? বিস্কিটে কামড় বসিয়ে পত্রিকা হাতে ধরে ভদ্রমহিলার উদ্দেশে নাদিমের বাবার ছোট্ট উক্তি।

মহিলা বললেন, তাই তো মনে হচ্ছে। হবে না? দুনিয়ায় তো আর বিচার-আচার নাই।

তাই তো! বিচার নাই। আচার নাই। ফ্যানের বাতাস খেতে খেতে আরেকটা বিস্কিটে যেই না কামড় তিনি বসালেন, অমনি দরজার আড়াল থেকে বাচ্চা ছেলের নাকি সুরে কান্না শোনা গেল, মা, দুইটাই তো খাইয়া ফেলল, তুমি না কইলা বুড়ায় একটা খাইব...

আনোয়ার চৌধুরী স্পষ্ট শুনতে পেলেন। তারপর প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বললেন, আজকালকার ছেলেরা যা নাটক করতে পারে না! দ্রুত চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তিনি উঠে পড়লেন।

বাবা বাসায় ফিরে এলেন। তার মাথা থেকে কিছুতেই এই চিন্তাটা যাচ্ছে না যে ৫ মে-তেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি তার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ বকুলকে ডাকতে লাগলেন, বউমা, বড় বউমা।

বড় ভাবি ছুটে এলেন।

শোন, তোমার সাথে আমার একটা কথা আছে। ভেরি কনফিডেনসিয়াল। দেখো তো পেপারে কী লিখেছে। ৫ তারিখে কি পৃথিবী সত্যি সত্যি ধ্বংস হয়ে যাবে?

বড় ভাবি বললেন, আমিও তো বাবা তাই শুনছি। সত্যমিথ্যা তো জানি না।

আচ্ছা একটা কথা বলো। ধরো একটা লোকের কিছু টাকা-পয়সা আছে। জমানো। বেশি না, অল্প কিছু। সামান্য কিছু। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে কি টাকাগুলোও ধ্বংস হয়ে যাবে?

আমার তো বাবা তাই মনে হয়।

তুমি ঠিক বলছ?

আমি আরেকটু চিন্তাভাবনা করে বলি?

আচ্ছা যাও।

বড় ভাবি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি লুকোতে লুকোতে অন্তর্হিত হলেন।

সিমি ডেকে পাঠিয়েছে। খুবই নাকি জরুরি ঘোষণা আছে তার।

নাদিম তাই বেরিয়ে পড়েছে ঘর থেকে।

সিমি ডেকেছে।

নাদিমের তো যাওয়াই উচিত। সে মনে মনে আবৃত্তি করছে আবুল হাসান থেকে, এই ভ্রমণ মানে আর কিছু নয়, কেবল তোমার কাছে যাওয়া।

আজিজ সুপার মার্কেটের পেছনের সিঁড়ির নির্জনতা ভেঙে সিমির ডাকে সমবেত যুব-সমাজ বসে গেছে।

নাদিমও গিয়ে সেই আড্ডায় যুক্ত হলো।

মেঝেতে বসে দেয়ালে ঠেস দিল। পা দুটো রাখল ঠিক হাঁটু ভাঙা দয়ের মতো করে। সিমিকে দেখাচ্ছে আগুনের মতো। ইস, গাঢ় নীল রঙের টি শার্ট, আর একটা হালকা নিল জিন্স। চুলটা খোঁপা করা, মাথার মধ্যখানে একটা সিঁথি। চুলগুলো তবু এলোমেলো। তার ফরসা লম্বাটে মুখ, নাকখানি শুকচঞ্চু। শুকচঞ্চু মানে টিয়াপাখির ঠোঁট। নাহ, উপমাটা ঠিক হলো না। টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো মানুষের নাক হলে ভয়াবহ হবে। নাদিমের চিন্তা আর বেশি দূর এগোতে পারল না। সিমি কেশে নিয়ে বলল, নাদিম এসে গেছিস। তাহলে শুরু করি। শোন, তোদের ডেকেছি আমার একটা প্রবলেম শেয়ার করার জন্যে। তোরা তো জানিস আমি বাবা-মার একমাত্র মেয়ে। এখন আমার বাবার শখ হয়েছে ৫ মের মধ্যে জামাই ঘরে আনবেন। দুনিয়াটা ধ্বংস হবার আগে এটা তাদের শেষ ইচ্ছা।

নাদিম বলল, বিয়েটা কবে খাচ্ছি। শোন, বিয়েতে সবাই পোলাও আর রোস্ট খাওয়ায়। তুই অন্য কিছু খাওয়াবি। যেমন ধর ঘি ঢালা গরম ভাত। কৈ মাছের ঝোল।

সিমি চিবুকটা তুলে চোয়াল দুটো শক্ত করে বলল, নাদিম। আমার সমস্যাটা সিরিয়াস।

নাদিম বলল, পাত্রটা কে?

সিমি বলল, আমি একটা অপরিচিত লোককে বিয়ে করতে পারব না। তোদের মধ্যে কেউ যদি আমাকে পছন্দ করিস তাহলে বলে ফেল। আমি বিবেচনা করব।

নাদিম বলল, টাকা-পয়সা খরচের ব্যাপার আছে নাকি?

সিমি বলল, নিশ্চয়। আমার মতো আহ্লাদি মেয়েকে না খাইয়ে রাখবি নাকি?

নাদিম বলল, তাহলে আর হলো না।

সিমি বলল, কাউয়ার্ড।

নাদিম বলল, এত বড় সম্মান দিতে হবে না। কাউ বললেই হবে। আর ইয়ার্ড লাগবে না।

সিমি বলল, শুধু পেঁচিয়ে কথা বললেই চিড়া ভেজে না।

নাদিম বলল, চিড়া ভেজাতে পানি লাগে। এক বোতল মিনারেল ওয়াটারের দাম দশ টাকা। কই পামু।

পাভেল বলল, তাইলে সিমি আমার কথাটা ভাবতে পারিস। তোর ওয়েটিং লিস্টের এক নম্বরে আমি থাকতে পারি।

কান্তা বলল, এই পাভেল? তুই আবার এর মধ্যে মোটা নাকটা গলাচ্ছিস কেন?

পাভেল বলল, কান্তা, আর আমার ওয়েটিং লিস্টের এক নম্বরে আমি তোকে রাখছি। তুই চিন্তা করিস না।

কান্তা বলল, যা বেটা ফোট। ·

পাভেল বলল, ওগো আমার কান্তা, কেন খাওয়াতে চাও পান্তা।

সিমি বলল, দ্যাখ। তোরা ভেবে দ্যাখ। আমি দুদিন সময় দিলাম।

নাদিম বলল, দুই দিন কি আর দুই মিনিট কী! আমি এইসবের মধ্যে নাই। চিনা বাদাম খাওয়াতে হলে থাকতে পারি, চাইনিজ খাওয়াতে হলে আমি নাই। আমি একজন পরিপূর্ণ বেকাল। বেকার বরিস। বাপের টাকা আছে, কিন্তু সে তো হাতের কাছে ভরা কলস তৃষ্ণা মেটে না হয়ে আছে। আমি বরং ওই গানটা তোদের এখন গেয়ে শোনাতে পারি, চেয়ে চেয়ে দেখলাম তুমি চলে গেলে, আমার বলার কিছু ছিল না।

রোজ গান ধরল, ফাইটা যায় টায়ার ফাইটা যায়, মোটকু যখন মুটকিরে লইয়া তিন চাকার রিকশা পাইয়া উইঠা যায়, টায়ার ফাইটা যায়।

নাদিম হো হো করে হেসে উঠল। এত হাসি সে জীবনেও হাসে নাই। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে যাবার জোগাড়।

কিন্তু আড্ডা ভেঙে যাবার পর যখন সে একা একা ফিরে আসছে, তার মনের টায়ার সত্যি সত্যি ফেটে যাচ্ছে। সিমির মতো একটা মেয়েকে সে এত কাছে পেয়েও ছুঁতে পারবে না। এই জীবনের কোনো মানে হয়? আসে না কেন ৫ মে, তাড়াতাড়ি, দুনিয়াটা কেন এখনই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না?

মাছওয়ালা এসেছে। চাই মাছ চাই মাছ বলে হাঁকছে।

নাদিমের বাবা আনোয়ার চৌধুরী বারান্দা থেকে তার ঝাঁকার ওপরটা দেখতে পেলেন একটা আস্ত রুই মাছ। বেশ বড়সড়। বাবা বললেন, কী ব্যাপার তুমি না ছোট মাছ বেচো। আজ যে দেখছি রুই মাছ!

মাছওয়ালা বলল, ওটা স্যার নিজের খাওনের লাইগা। বেচনের লাইগা না। পুঁটি মাছ বেচি বইলা কি আর স্বাদ আল্লাদ নাই? দুইনাটা যদি স্যার ছাতু হইয়াই যায়, তাইলে আর টাহা-পয়সা জমায়া থুয়া লাভ কী? স্যার, আপনে তো স্যার আমার পুঁটি মাছের পারমানেন্ট কাস্টোমার। আপনেরে স্যার অনেক ঠকাইছি। আপনে স্যার আমারে ক্ষমা ঘেন্না কইরা দিয়েন।

মানে?

বহুদিন স্যার আপনেরে এক্কেরে পচা গলা মাছ দিছি গছায়া। দুইনাটা নাকি ভাইঙা

যাইব। আপনে আমি কেউই থাকুম না। তাইলে আর আপনেরে ঠকায়া কী লাভ? আপনে স্যার আমারে অহনই মাফ কইরা দেন। পরে যদি আর সময় না পান!

মাফ। আমাকে তুমি ঠকিয়েছ, তোমাকে তো আমি মাফ করব না। আমার নাম আনোয়ার চৌধুরী। কোনো কিছু বেচে আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে ঠকাতে পারেনি। আর তুমি বলছ আমাকে ঠকিয়েছ। তোমার মাফ নাই মাছওয়ালা। তুমি যাও।

স্যার। দুইনাটা যদি মেছমারই হইয়া যায়, তাইলে আমার উপরে রাগ রাইখাই আপনের কী লাভ, না রাইখাই বা কী লাভ! তার বদলে মাফ কইরা দেন, আমি খাস দিলে আপনেরে দোয়া করি। আল্লাহ আপনেরে বেহেশত নসিব করব।

আনোয়ার চৌধুরী বললেন, আচ্ছা ভেবে দেখি। আচ্ছা, একটা কথা সত্যি করে বলো তো, পৃথিবীটা কি সত্যি ধ্বংস হয়ে যাবে?

ধ্বংস যদি স্যার হয়ই, তাইলে কি আর মিছামিছি হইব। হাছা হাছাই হইব।

হুঁ। তাহলে তো আমাকেও একটা বড় মাছ কিনতে হয়। যাও, তোমার মাছ কিনব না। আজ বাজারেই যাব।

স্যার আপনের কথা শুইনা আমার রুই মাছ হা কইরা হাসতেছে, হেয় ভাবতেছে কিপ্টা বুড়া কয় কী, হে খাইব রুই মাছ?

আরে বদমায়েস চোপ। দ্যাখ আমি এখনই চললাম বাজারে।

আনোয়ার চৌধুরী বাজারে গেলেন। একটার পরে একটা মাছ তিনি পার হয়ে গেলেন। মাছগুলো সুন্দরই বটে। অনেক বড় বড় মাছই তো দেখা যাচ্ছে বাজারে ওঠে। তিনি এতদিন এসবের কোনো কিছুই দেখেননি। অনেক আগে অবশ্য দেখতেন। ওদের মা বেঁচে থাকতে। মহিলা খুবই খরুচে ছিল। খরচ বেশি করে করে বেশি বেশি খেয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি ওপারে চলে গেছে। ৫ তারিখের পরে তো সবাইকেই যেতে হবে। এখন টাকাই বা বাঁচিয়ে লাভ কী, আর শরীরই বা চোস্ত রেখে ফল কী! মরতেই যখন হবে খেয়েই মরি। তিনি একটা বড়-সড় রুইয়ের দিকে গেলেন। এটাই তিনি কিনবেন। এই দাম কত?

আড়াইশ টাকা কেজি?

কত কেজি হবে?

মাছওয়ালা পাল্লায় তুলল মাছটা। ৮ কেজি ৪০০ গ্রাম। ২১০০ টাকা হয় স্যার।

নাদিমের বাবার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। তিনি বুঝি এখনই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পরলোক গমন করে ফেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি করে অন্য দিকে তাকিয়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন বিপরীত দিকে। মাছওয়ালা চেঁচাতে লাগল, স্যার, দাম শুইনা যাইতেছেন ক্যান স্যার। কী মাছ দিছিলাম দেখবেন না। বাবার কানে এ সবের কিছুই ঢুকছে না। তিনি পালাতে পারলে বাঁচেন।

আরে স্যার ১৮০০ টাকা দিমু। লাস্ট দাম। লন স্যার। মাছ পাইয়া বেগম সাহেবা কেমন খুশি হয় দেইখেন।

বেগম সাহেবা খুশি হবে? বেটা বলে কী? তখন তাঁর মনে পড়ল তার

পরলোকগতা স্ত্রীর মুখ। মহিলা বড় মাছ দেখলে সত্যি খুশি হতেন। কিন্তু এত দাম দিয়ে মাছ কেনা কি অন্যায় নয়? হঠাৎই তাঁর মনে পড়ে গেল পুঁটি মাছওয়ালার টিটকারি, স্যার আপনের কথা শুইনা আমার রুই মাছ হা কইরা হাসতেছে, হেয় ভাবতেছে কিপ্টা বুড়া কয় কী, হে খাইব রুই মাছ?

না। আজ বাড়ি বিক্রি করে হলেও তিনি রুই মাছ কিনবেন।

স্যার খুব ভালো মাছ স্যার। গোয়ালন্দের রুই মাছ স্যার। দেইখেন সস্তায় ইন্ডিয়ার মাল কিইনেন না। ওষুধ দেওয়া থাকে। আসেন ১৭৫০ টাকা। লাস্ট দাম। নিলে লন, না লইলে পস্তান।

বাবা ফিরে এলেন। বললেন, দাও দেখি। ব্যাগে ভরে দাও। দামটা একটু কম নিও মিয়া। দুদিন পরে দুনিয়াটা পাঁপড় ভাজার মতো মুচ-মুচ করে ভেঙে যাবে। এত লাভ করে করবেটা কী?

তাও তো কথা। আচ্ছা লন। লাভ ছাইড়া দিলাম। ১৭০০ টাকা ফাইনাল।

বাবা টাকা গুনে দিলেন। তার কলজে ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু কী করা। লোকটা নাকি লাভও ছেড়ে দিয়েছে!

বাবা বাজার থেকে ফিরছেন। রিকশায়। ব্যাগে সদ্য কেনা মাছটার ইয়া বড় মাথা বের হয়ে আছে। তার এক ধরনের গর্বই হচ্ছে। এই মাছ তিনি নিজে কিনেছেন। গোটাটাই। শেয়ারে না। তবে রিকশাটা শেয়ারেই ভাড়া করেছেন। তার পাশে উঠেছে জহির সাহেব, দুই বাসা পরে তাদের বাসা।

বাবা বললেন, কী রিকশাওয়ালা। দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শুনেছ কিছু?

রিকশাওয়ালা বলল, হ স্যার।

তা দুনিয়া ধ্বংসের আগে তোমার কোনো কিছু চাওয়া নাই?

জি স্যার। বউ-বাচ্চা লইয়া নিজের রিকশায় সাহেব-বিবিগো মতন ঘুরুম। প্যাসেঞ্জার সিটে বইয়া। হাওয়া খামু। আর কমু জোরে চালাও মিয়া। ভাড়া তোমারে দুই টাহা বেশিই দিমু।

রাস্তায় জহির সাহেব নেমে গেলেন, বললেন, আনোয়ার সাহেব। আমার শেয়ারটা। এই নিন ৩ টাকা। ঠিক আছে?

বাবা ৩ টা টাকা পকেটে পুরে বললেন, একদম ঠিক আছে। আমি গিয়ে নেমে পুরো ৩ টাকা দিয়ে দেব দেখবেন। পুরো ৩ টাকা।

বাসার সামনের রাস্তা। বাবা রিকশায় চড়ে একা আসছেন।

মেজ ভাই দোতলার বারান্দা থেকে দেখল বাবা রিকশায় আসছেন।

তিনি সবাইকে ডাকলেন বাসার ভেতরে গিয়ে। ওগো শুনছ। এই চঞ্চলের মা। ভাবি, বড়ভাই, সবাই কই? চলো চলো সবাই। বারান্দায় চলো। একটা অদ্ভুত সিন দেখাব।

বাসার সবাই দৌড়ে বারন্দায় এলো। দেখল বাবা রিকশা থেকে নামছেন। ভাড়া দিচ্ছেন। সবাই খুশিতে তালি দিয়ে উঠল। আহা! কতদিন এই রকম একটা খুশির

দৃশ্য দেখা যায় না। বাবা রিকশায় চড়ে বাজার থেকে ফিরছেন। মা মারা যাবার পর থেকে বাবা হেঁটে হেঁটেই বাজার করা অনুশীলন করে আসছেন।

বাবা ড্রয়িং রুমে পেপার পড়ছেন। এটা তিনি নিজে গিয়ে হকারের কাছ থেকে কিনে এনেছেন। দাম পুরো আট টাকা নিয়েছে। ইস। দুটো গোটা ডিম হয় ৮ টাকায়। অপচয় আর কাকে বলে। তবু পেপারটা কিনতে হলো, কারণ তিনি একটা পত্রিকা কিনতে গিয়ে বিনা পয়সায় তিনটা পত্রিকা ফেরিওয়ালার কাছ থেকে নিয়ে পড়ে ফেলেছেন। শেষে চার নম্বর কাগজটা কিনেছেন। ফলে তার কাগজের দাম পড়েছে ৮/৪=২ টাকা।

এখন ঘরে বসে বসে তিনি সেই হৃদয়-বিদারক খবরটাই পড়ছেন।

৫ মে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। ভারতের জ্যোতিষীরাও এই মতের সঙ্গে একমত।

বাংলাদেশের বিশ্বজাতক জ্যোতিষী-সম্রাটও দুনিয়া ধ্বংসের আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেছেন, চিন্তা করে লাভ নাই। ফুল ফুটে ঝরে যায় দুনিয়ার রীতি, আজ যার শুরু হয়, কাল তার ইতি। জন্মিলে মরিতে হবে, অমর সে কোথা কবে।

বাবা খবর পড়েন আর তার বুকটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। তিনি এবার ডাকলেন তার মেজ পুত্রবধূকে। মেজ বউমা। একটু শুনে যাও তো।

মেজ ভাবি এগিয়ে এলেন, জি বাবা।

বসো। দেখো কাগজে কী লিখেছে? আচ্ছা বলো তো, দুনিয়াটা যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে কি আমার জমানো টাকা-পয়সাও ধ্বংস হয়ে যাবে?

মেজ ভাবি বললেন, তাই তো মনে হয়। আপনার কী মনে হচ্ছে বাবা?

বাবা বললেন, আমারও তোমার মতোই মনে হচ্ছে। তবে আমি ঠিক শিয়োর না।

মেজ ভাবি চলে গেলেন বাবার সামনে থেকে।

মেজ ভাই এলেন। দেখতে পেলেন, বাবা বেশ মন দিয়ে কাগজ পড়ছেন। আর কাগজটাও আজকের নতুন টাটকা কাগজ।

মেজ ভাই বললেন, বাবা আপনার তো বেশ কাগজ পড়ার নেশা হয়েছে।

বাবা মুখ না তুলেই বললেন, যে খবর, তাতে তো নেশা না হয়ে উপায় আছে?

তাহলে বাবা হকারকে বলে দেই। কাল থেকে আমাদের টাটকা পেপার দিক। বাসি পেপার পড়লে তো আর চলছে না।

হকারকে বলে দিবি? টাকা?

বিল তো বাবা মাসের শেষে। দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে গেলে তো বাবা আর বিল দিতে হচ্ছে না।

তাহলে দে বলে দে। যে কদিন বাঁচি গরম খবর টাটকা পড়ি। বিলটা কিন্তু ওই ৫ তারিখের পরে।

বাসায় আজ বড় মাছ রান্না করা হচ্ছে। কতদিন পর। কতদিন এই বাসায় বড় মাছ

আসে না। মা মারা যাবার পর থেকেই কিপ্টেমির এই বাতিকটা ধীরে ধীরে বাবার মাথায় গেড়ে বসেছে।

আজ থেকে সেই ভূত বাবার কাঁধ থেকে নামতে শুরু করল?

দুই ভাবি মাছ রাঁধছেন।

বেশ খুশবু ছড়িয়েছে।

নাদিম সেখানে এসে ঘুর ঘুর করছে।

কী ব্যাপার, তুমি এখানে বেড়ালের মতো ঘুরঘুর করছ কেন? বড় ভাবি বললেন।

নাদিম বলল, তোমাদের সাথে আমার একটা কথা আছে।

দুজনের সাথেই?

জি।

বলে ফ্যালো।

নাদিম তার সমস্যাটার কথা বলতে শুরু করল। দুনিয়া আছে আর মাত্র কটা দিন। এর মধ্যে সিমি মেয়েটাকে বর বাছাই করতেই হবে। সিমির পছন্দ নাদিমকে। কিন্তু সে কি আর সিমির প্রস্তাবে সাড়া দিতে পারবে? তার বাবা যে কিপ্টে! তাহলে কি তার চোখের সামনে সিমির বিয়ে হয়ে যাবে অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে! ভাবি, তোমরা দুজন দ্যাখো। বাবাকে বলে কয়ে যদি রাজি করাতে পারো!

মেজ ভাবি বলেন, রাজি করাতে পারলে কী দেবে?

নাদিম বলে, তোমাদের সেবিকা দেব। তোমাদের আর রান্নাঘরে আসতেই হবে না।

মানে? তোমার বউ আমাদের রেঁধে খাওয়াবে?

মনে হয় না। তবে বুদ্ধি করে বাবাকে পটিয়ে একটা কাজের মেয়ে রাখার পারমিশন ও নিশ্চয় আদায় করে নেবে।

সেও কম না। দুই ভাবি ভাবেন। দেখা যাক বাবাকে বলে!

বাবা ভাত খাচ্ছেন। দুই ভাবি তার পাতে মাছের মুড়ো তুলে দিচ্ছেন।

মেজ ভাবি বললেন, বাবা। একটা কথা বলি।

বাবা বললেন, একটা কথা কেন? দুটো কথা বলো।

বড় ভাবি বললেন, তাই তো দুটো কথা বলো। কথা বলতে তো আর আর ট্যাক্স দিতে হয় না।

মেজ ভাবি বললেন, নাদিম তো বড় হয়ে গেছে। ওর একটা বিয়ে দিলে হয় না।

বাবা বললেন, ওর একটা বিয়ে দিলে হয় না! বলল একটা কথা। গাধাটা কিছু করে নাকি? ওর বউ খাবে কি? নাদির নাসির আমার ব্যবসা দেখে। বিনিময়ে আমি তোমাদের খাওয়াই। নাদিমের ইনকাম নাই। ওর বউকে আমি আমার তহবিল ভেঙে খাওয়াব নাকি?

বড় ভাবি একটা হাতপাখা নেড়ে বাতাস করে বললেন, ও-ও কাজ করবে।

বাবা বললেন, আগে কাজ করুক। ৬ মাস তো আমার প্রতিষ্ঠানে বেতন হয় না। ৭ নম্বর মাস থেকে বেতন। সেটা তো সংসারে খাওয়ার খরচ দিলেই শোধবোদ হয়ে যাবে। ওর বউয়ের খাওয়ার জন্যে মিনিমাম দুই বছর ওকে চাকরি করতে হবে।

মেজ ভাবি বললেন, বাবা যদি ৫ তারিখে দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যায়ই, ওর মনের একটা শখ পূরণ হবে না?

বাবা ধমকে উঠলেন, চুপ করো। বিয়ের খরচ আছে না? চুপ করো।

নাদিম খোঁজ নিতে এলো ভাবিদের কাছ থেকে! বাবার মনের অবস্থা কেমন? বিয়ের ব্যাপারে বরফ গলার কোনো সম্ভাবনা আছে নাকি!

ভাবি দুইজনই হতাশা প্রকাশ করলেন। না, বিয়ের খরচ দেবার মতো উদারতা এখনও বাবার মনে আসেনি। আসেনি, তবে আসতে কতক্ষণ। বড় ভাবি সান্ত্বনা দিলেন।

কী করা যায়? নাদিম ভাবতে লাগল। উপায় একটা বের করতেই হবে। চেয়ে চেয়ে দেখলাম, তুমি চলে গেলে, তুমি চলে গেলে, চেয়ে চেয়ে দেখলাম, তা হবে না। অবশ্যই আমার কিছু করার আছে। সেটা আমাকে করতেই হবে। তুমি বাবা যেমন আনোয়ার চৌধুরী, আমিও তারই ছেলে নাদিম চৌধুরী। পরামর্শ করতে সে যায় বড় ভাই আর মেজ ভাইয়ের কাছে।

ভেবে ভেবে সারা রাত আর নাদিমের ঘুম আসে না।

## ৫

ভোরবেলা। হকার আজকের দিনের কাগজ দিয়ে গেল দরজার নিচ দিয়ে। ডোরবেল টিপল। বাবা গিয়ে কাগজটা হাতে নিলেন। আবার ডুমস ডের খবর।

তাহলে পৃথিবীর আর বাঁচার উপায় নাই। ধ্বংস তাকে হতেই হচ্ছে।

এই সময় নাদিম এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। সে মুখ বিকৃত করে কাঁদছে। ভেউ ভেউ করে শব্দও হচ্ছে।

কীরে কাঁদছিস কেন?

বাবা। স্বপ্নে মাকে দেখলাম। মা বলল, ওরে খোকন তোর বাবাকে বল, বক্কিলার ধন টিয়ায় খায়। কৃপণের গুড় খায় পিঁপড়ায়। টাকাগুলো সিন্দুকে বন্ধ না রেখে তোদেরকে যেন ভাগ-বাটোয়ারা করে দেয়। দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে গেলে আর টাকা দিয়ে তোর বাবা কী করবে?

তোর মা থাকলে তো আর আমাকে টাকা-পয়সার হিসাব করতে হতো না। ওই সব করত। তবে সে খুব বেহিসাবী ছিল। তার পক্ষেই এরকম বাজে প্রস্তাব করা সম্ভব। তোর মা কি আমাকে কৃপণ বলল?

আরে না। তোমাকে বলবে কেন?

ওই যে কী বললি? কৃপণের গুড়?

বাবা সে তো যে কিপ্টে তার কথা, তুমি তো বাবা কিপ্টে নও।

না না আমি কী করে কিপ্টে হই। কিপ্টেরা কী করে জানিস, পিঁপড়ের পেট চিপে গুড় বের করে, সেটা আমাকে তোরা করতে দেখেছিস কোনোদিনও?

দেখিনি, তবে দেখতে কতক্ষণ?

কী বললি?

না, কিছু না। বাবা, মার কথাটা কিন্তু ভেবে দেখো।

নাদিম চলে গেল।

খানিকক্ষণ পরে বাবার সামনে এলেন মেজ ভাই। বাবা, টেলিফোনের তালার চাবিটা একটু দেবেন?

বাবা বললেন, কেন? ফোনের চাবি দিয়ে কী হবে?

মেজ ভাই বললেন, দোকানে বলে দেই, আজ আর যাচ্ছি না।

কেন? যাবি না কেন? তাহলে ওরা সব মেরে কেটে খাবে...

না বাবা মনটা ভালো না। স্বপ্নে দেখলাম, মা বলছে, ওরে আর কদিন পরেই তো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, দোকান করে আর কী করবি? বরং একটু রেস্ট নে। তোর বাবাকে বল, ওর সিন্দুকটা একটু খুলতে, টাকাগুলো তো সব আগুনেই পুড়বে, নাকি? মেজ ভাই কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

বাবা মুশকিলে পড়লেন। নাসিরের মা শুরুটা করল কী? ছেলেদের স্বপ্ন দেখাচ্ছে কেন? আর এই ধরনের কথা বলার মানে কী? অন্য কোনো কথা সে বলতে পারে না।

আরো খানিক পরে এলেন বড় ভাই। বাবা!

বাবা বললেন, কী?

মা তোমাকে বলেছে হাতের আঙুল একটু ফাঁক করতে। যাতে দুই-চারটা পয়সা এদিক-ওদিক গড়িয়ে পড়ে...বলল, তোর বাবাকে লোকে কেপ্পন বলে রে, আমার খুব কষ্ট হয়...

বাবা বললেন, তোর মা *তোদের* স্বপ্ন দেখাচ্ছে কেন? আমাকে বললেই তো পারে!

মেজ ভাবি তখন ওখান দিয়েই যাচ্ছিলেন। বাবার কথা শুনে ফোঁড়ন কাটলেন, বাবা আপনি কি আর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখবেন, ওতে আপনার ঘুম অপচয় হয়ে যাবে না?

বাবা বললেন, না না। ঘুমের সাথে স্বপ্ন হলো ফাউ। ফাউ পেতে তো আমার কোনো অসুবিধা নাই।

মেজ ভাবি বললেন, তাহলে বাবা আপনি ঘুমান, নিশ্চয় স্বপ্ন দেখতে পাবেন।

৬

কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘপথ, উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ! নাদিম নিজেকে উৎসাহ দেয়। বাবা রাজি নন। সিমির বিয়ে হয়ে যাবে। তার সঙ্গে নয়। অন্য কারো সঙ্গে! মেয়েটা কত সুন্দর করে হাসে। বাঁ দিকে ওপরের পাটিতে একটা দাঁতের ওপরে আরেকটা দাঁত উঠে গেছে। হাসলে মেয়েটাকে কত সুন্দর লাগে! এ রকম একটা মেয়েকে নিয়ে জ্যোৎস্না ভরা কোনো এক রাতে নির্জন বারান্দায় বসে থাকলে কী রকম লাগবে, ভাবা যায়! ভাবা যায়, কিন্তু বাস্তবে সেটা ঘটানোর শেষ সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। না না। সেটা হতে দেওয়া উচিত হবে না। উপায় একটা বের করতে হবে। বাবাকে পটাতে হবে। বাবাকে রাজি করাতে হবে। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। আঙুল বাঁকা করতে হবে। কিন্তু বাঁকা আঙুলেই বা কতটুকুন ঘি উঠবে। সবচেয়ে ভালো হলো চামচ ব্যবহার করা। সে চামচই ব্যবহার করবে।

নাদিম হাঁটছে। প্রথমে সে যাবে মোর্তোজা ভাইয়ের কাছে। একটা মিনি ক্যাসেট প্লেয়ার ধার নেবে। তারপর সেটা নিয়ে যাবে আপার বাসা। মোর্তোজা সাংবাদিক। একটা পত্রিকা অফিসে কাজ করে। ইস্কাটনে তাদের পত্রিকা অফিস। মোর্তোজার দেখা পাওয়া গেল। তিনি বললেন, কী খবর নাদিম। হঠাৎ?

আছে দরকার। আপনারা কেমন আছেন?

আমরা? কেমন থাকব বলো। কী সব ঘটছে চারদিকে! ৫ মে নাকি কেয়ামত আসছে। লোকে পাগল হয়ে গেছে। তার সাথে পাগল হয়ে গেছে পত্রিকাগুলোন। কে কত বড় হেডলাইন করবে, প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। কোনো মানে হয়!

নাদিম বুঝতে পারছে না, সে কী বললে মোর্তোজা ভাই খুশি হবেন। সে বলল, না কোনো মানে হয় না।

মোর্তোজার সামনের চেয়ারে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনি একটা চায়ের কাপে সিগারেটের ছাই ফেলে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, কেন মানে হবে না। সায়েন্টিফিক্যালি যদি বিগ ব্যাং থেকে মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু হয়, তাহলে একটা বিস্ফোরণ তো মহাকাশে ঘটতেই পারে।

মোর্তোজা ভাই চশমাটা খুলে কাচ মুছলেন। তারপরে বললেন, ঘটলে তো ভালোই। আমরা সবাই বেঁচে গেলাম। না ঘটলে কী হবে, আপনি ভেবে দেখেছেন। যে পত্রিকাগুলো এত বড় বড় করে প্রলয় প্রলয় করে চেঁচাচ্ছে, তারা পরের দিন কী নিউজ করবে। অল্পের জন্যে রক্ষা পেল পৃথিবী! প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর স্বস্তি প্রকাশ! হ্যাঁ বলো নাদিম কেন এসেছো?

মোর্তোজা ভাই। একটা মিনি ক্যাসেট রেকর্ডার দেওয়া যাবে। ধার?

যাবে। কেন বলো তো।

আছে দরকার।

কবে ফেরত দিবা?

৫ মের আগেই দেব মোর্তোজা ভাই।

মোর্তোজা হো হো করে হাসতে লাগলেন।

মিনি ক্যাসেট রেকর্ডার নিয়ে নাদিম এখন যাবে আপার বাসার দিকে। তার মনে একটা আইডিয়া এসেছে। আইডিয়াটা এক্সারসাইজ করে দেখা যায়। খালি আপার সহযোগিতাটা ঠিকভাবে পেলে হয়। আপার বাসায় ঢোকার একটা সমস্যা আছে। গেটের ভেতরে একটা কুকুর ছাড়া থাকে। সে ঘেউ ঘেউ করতে করতে তেড়ে আসে। দৌড়ে এসে গা শোঁকে। নাদিম বলল, মোর্তোজা ভাই, একটা ফোন করব। আর আপনার ফোন রেকর্ডের যন্ত্রটা দেন।

মোর্তোজা বললেন, ফোন তো না বলে ট্যাপ করা যায় না।

নাদিম বলল, বলেই ট্যাপ করব মোর্তোজা ভাই।

নাদিম ফোন করল দুলাভাইয়ের অফিসে। দুলাভাই কেমন আছেন?

দুলাভাই বললেন, আছি ভালো। শুধু তোমার আপার মেজাজটা বেশ খারাপ। তোমরা খোঁজ খবর নাও না। ও খুব রেগে আছে।

নাদিম বলল, আমি আপনাদের বাসায় যাচ্ছি। কুকুরটাকে ভয় পাই তো।

দুলাভাই বললেন, ওর নাম টমি। নাম ধরে ডাকো। কুকুর বললে আমার খুব খারাপ লাগে নাদিম।

নাদিম বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি এখন আপনার টমিকে বলেন, ও যেন ঘেউ ঘেউ না করে। আমি সেটা রেকর্ড করে নিয়ে যাব। ওকে শোনাব। ও আশা করি আপনার ভয়েস রিকগনাইজ করতে পারবে।

কী বলব?

বলেন, হাই টমি, ডোন্ট বার্ক। ইটস নাদিম। আমার ব্রাদার ইন ল।

দুলাভাই বললেন, টমি। আমি। তোমার ফ্রেন্ড ফিলোসফার এন্ড গাইড। ডোন্ট বার্ক। ইটস নাদিম...

আপার বাসার গেটের সামনে এসে নাদিম ছোট গেট আস্তে করে খুলল। অমনি ঘেউ ঘেউ। নাদিম তাড়াতাড়ি ক্যাসেট অন করল। দুলাভাইয়ের গলা শুনে টমি ঠাণ্ডা মেরে গেল। আনন্দে লেজ নাড়তে লাগল। দারোয়ান ছুটে এসে ধরল টমিকে। নাদিম ভেতরে ঢুকে গেল।

আপা বললেন, কী ব্যাপার নাদিম। কেন এসেছিস?

নাদিম বলল, তোমাদের অনেকদিন দেখি না। তাই এলাম।

আপা বললেন, দেখবি কোত্থেকে। আমরা কি আর তোদের বাসায় যাই নাকি। যাবও না। বাবা সেদিন তোর দুলাভাইয়ের সাথে একটা শার্ট নিয়ে যা করেছে। ছিছিছি...

নাদিম বলল, আপা। আমিও ভাবছি বাবার এই রোগের একটা চিকিৎসা হওয়া দরকার।

আপা বললেন, ঠিকই। ধরে বেঁধে বাবাকে একটা ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট দেখা।

নাদিম বলল, আপা, ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। ডাক্তার একটা প্রেসক্রিপশন দিয়েছে। বাবার কিপ্টেমি অসুখের মেডিসিন। তোমার ভয়েস আর মার ভয়েস একদম এক। তুমি একটা কাজ করো। একটা ডায়লগ বলো। আমি রেকর্ড করি। মার সংলাপ বলতে হবে তোমাকে।

আপা বললেন, না। আমি মার ক্যারেক্টারে অভিনয় করতে পারব না।

আপা তুমি চাও না বাবা ভালো হয়ে উঠুক। নাকি চাও না?

আপা নীরব।

নাদিম বলল, ভেবে দ্যাখো দুলাভাইকে বাবা কী অপমানটাই না করল। একটা শার্টের জন্যে... তার ওপরে সিংকে রাখা বাসি টি-ব্যাগ, সব এঁটো-কাঁটার মধ্যে ছিল পড়ে, সেটা দিয়ে কেমন দুলাভাইকে চা খেতে দিল...

বাবা খুব অন্যায় করেছে।

তাহলে বলো তুমি চাও না বাবার কিপ্টেমি অসুখটা সেরে উঠুক?

চাই।

নাও। এই ডায়লগটা পড়ো। এটা আমি রেকর্ড করে নিয়ে যাব। আগে একটু রিহার্সাল করে নাও।

দে। ভালোই তো লিখেছিস। বড় হলে তো তুই নাট্যকার হতে পারবি।

সেই। বড় হওয়াটাই শুধু হচ্ছে না।

ক্যাসেট প্লেয়ার অন কর। আমি পড়ছি।

নাদিম ক্যাসেট রেকর্ডার অন করল।

আপা কাগজ দেখে পড়ে চললেন :

ওগো শুনছ। দুনিয়া ধ্বংস হতে আর দেরি নাই। অথচ তুমি সব টাকা তোমার সিন্দুকে তুলে রেখেছ। টাকা দিয়ে তুমি কী করবে? সব তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তার চেয়ে তোমার ছেলে-মেয়ে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনী এদের সব ভাগ করে দাও। কিছু ভালো কাজ করো। একটা স্কুলে দান করো। হাসপাতালে কিছু দান করো। তাতে তোমার ফাউ লাভ। ৫ তারিখের পরে এই টাকা তো এমনিই নষ্ট হবে। আগেই কিছু কাজে লাগাও। শোন, মেয়েকে একটু বেশি দেবে।

নাদিম বলল, আপা, এই ডায়লগটা বেশি দিলে কেন?

আপা বললেন, শোন এটা রাখবি। না হলে কিন্তু আমি বাবাকে সব বলে দেব।

নাদিম বলল, আচ্ছা বাবা রাখব। থ্যাংক ইউ আপা। শোন, এখন কিছু ধার দাও। বাবার কিপ্টেমি গেলে শোধ করে দেব।

কত?

৫০০।

পাঁচ শয় হবে। বাবার চিকিৎসার টাকা লাগছে না? নে। ১০০০ দিলাম।

থ্যাংক ইউ।

ওয়েলকাম।

টাকাটা নিয়ে নাদিম কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। মা মারা যাবার পরে একসঙ্গে এতগুলো টাকা দেখা হয়েই ওঠে না। এই আনন্দদায়ক মুহূর্তে সে করবেটা কী? সে গেল আপার বাসার টেলিফোনের কাছে। ফোন করল সিমির মোবাইলে।

সিমি ফোন ধরল। হ্যালো। আহ কী সুন্দর কণ্ঠস্বর। যেন জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে। কী মিষ্টি। যেন স্পঞ্জ রসগোল্লা।

এই আমি নাদিম।

ফোন করলি যে? ব্যাপারটা কী?

ব্যাপার কী মানে?

ফোন করছিস, বিল উঠছে না।

আরে এটা তো আপার ফোন। আমার নাকি!

তো আপাটা কার? তোর না আমার?

আমার।

তাহলে। তার দুই টাকা লস হবে, তোর ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাবে না।

আরে না। দুলাভাই টিএন্ডটির ইঞ্জিনিয়ার। বিল বেশি আসলে উনি বুঝবেন।

ও। তা বলে ফেল, ফোন কেন করেছিস। আমার মোবাইলের ইনকামিং বিল তো তোর দুলাভাই দিয়ে দেবে না।

দেবে?

কেমন করে?

আপার কাছ থেকে এখনই এক হাজার টাকা নিয়েছি। আজকে তুই আমার সাথে এক ঘণ্টা কথা বলবি। তোর ইনকামিং বিল দুইশ টাকা আমি দিয়ে দেব।

ঘটনা কী? এই, তুই কিছু খাস-টাস নি তো!

হ্যাঁ খেয়েছি।

কী?

এই তো আপা একটু আগে চা খাওয়াল, কেক-পেটিস খাওয়াল।

আ রে না! অন্য কিছু।

অন্য কিছু মানে?

বাদ দে বুদ্ধু। ফোন করেছিস কেন সেটা বল।

তোর খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্যে।

তুই কোনো ভালো পাত্র পেলি?

পেয়েছি। তবে সমস্যা হচ্ছে একটা না। কয়েকটা। ডিসিশন নিতে পারছি না।

লটারি কর।

লটারি করব। বিয়েটা কি কোনো ছেলে-খেলা নাকি!

ছেলেরা খেললে ছেলে-খেলা, মেয়েরা খেললে মেয়ে-খেলা। তুই তো মেয়ে। তোরটা তাহলে মেয়ে-খেলা।

শোন, তুই এই পেঁচিয়ে কথা বলাটা কবে ছাড়বি?

তোর বিয়েটা হয়ে গেলেই। আমি ঠিক করেছি, তোর বিয়েটা হয়ে গেলে আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব। ঘর-সংসার ছেড়ে জঙ্গলে চলে যাব।

কেন?

বারে। তোর বিয়ের শকটা আমি সহ্য করতে পারব নাকি!

তাহলে যে বললি লটারি করতে।

আরে লটারির প্রত্যেকটা কাগজে আমার নাম লেখ। তারপর তোল। দেখবি, ম্যাজিক। এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটবে।

শোন। তোর বয়স হয়েছে। একটু দায়িত্ব-টায়িত্ব নিতে শেখ। মনে মনে ভালোবাসা, দূর থেকে আড় চোখে চেয়ে থাকা, ভোস ভোস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলা এইসব দিন চলে গেছে। একটা চাকরি-বাকরি জোগাড় কর। নইলে একটা বিজনেস-টিজনেস স্টার্ট কর। করে একটা ভালো দেখে মেয়ে বিয়ে-টিয়ে করে সংসারী হ।

শোন সিমি। আমি যাই করি না কেন, তার ফল আগামী ৫ তারিখের মধ্যে ফলা সম্ভব না। সুতরাং আমি তোর বিয়ে খেতে আসছি। গিফট হিসাবে তোর জন্যে আমি একটা গানের ক্যাসেট দিব। মমতাজের গান। ফাইটা যায় বুকটা ফাইটা যায়...

খবরদার, এইসব ফালতু গান আমার সামনে গাবি না। কাজের কাজ কিছু করার মুরোদ নাই...

ও ভাবে বলে না গো! আমি একটা উদ্যোগ নিয়েছি। সেই উদ্যোগের পার্ট হিসাবে এখানে এসেছিলাম। কাজটা প্রায় হয়ে গেছে। কাজেই তোকে আমি একটা কথা এখনই বলে রাখি।

কী কথা?

আমি তোমাকে ভালো...

মানে কী?

আমি তোমাকে ভালো...

আরে বেটা সাহস থাকে তো পুরোটা বল।

সাহস আছে। কাজটা অল্পের জন্যে আটকে আছে। তাই আমিও তোকে ভালো পর্যন্ত বলতে পারলাম। বাকিটা সময়মতো বলতে যেন পারি দোয়া কর। আর যদি না পারি, তবে তোর জন্যে দোয়া করব। তুই সুখী হ।

নাদিম, এই নাদিম। কার সাথে এত কথা বলিস? আপার চিৎকার।

নাদিম বলল, রাখি রে। নিজের বোনের ফোনে কথা বলে বেশি মজা নাই। কোনো একটা এমপির ফোন পেলে কথা বলে মজা হতো।

নাদিম ফোন রেখে দিল।

নাদিম অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কখন রাত হবে। কখন বাবা ঘুমুতে যাবে। যেই বাবার চোখে তন্দ্রামতো আসবে, অমনি প্লেয়ারটা অন করে দিতে হবে। আল্লাহ, মুখ তুলে চেয়ো গো খোদা।

রাত্রিবেলা। বাবার ঘর। বাবা ঘুমুতে গেছেন। ঘর আলো-আঁধারিতে ঢাকা। নাদিম জানালার পর্দা সামান্য তুলে বাবার মুখভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করছে। বাবা একেবারে ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। আবার জেগে থাকলে তো পুরো ধরা পড়ার ভয়। আধো ঘুম আধো জাগরণ হলো শ্রেষ্ঠ সময়। কিন্তু সেটা ঠাওর করা মুশকিল।

বাবা মনে হয় ঘুমিয়েই পড়লেন। তার পেটটা ওঠানামা করছে।

এখনই উপযুক্ত সময়।

জানালার ধারে নাদিম ক্যাসেট প্লেয়ারটা অন করল। মায়ের মতো কণ্ঠস্বর করে আপা বলছেন :

ওগো শুনছ, দুনিয়া ধ্বংস হতে আর দেরি নাই। অথচ তুমি সব টাকা তোমার সিন্দুকে তুলে রেখেছ। টাকা দিয়ে তুমি কী করবে? সব তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তার চেয়ে তোমার ছেলে-মেয়ে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনী এদের সব ভাগ করে দাও। কিছু ভালো কাজ করো। একটা স্কুলে দান করো। হাসপাতালে কিছু দান করো। তাতে তোমার ফাউ লাভ। ৫ তারিখের পরে এই টাকা তো এমনিই নষ্ট হবে। আগেই কিছু কাজে লাগাও। শোন, মেয়েকে একটু বেশি দেবে।

বাবা ঠিক বুঝতে পারলেন না, এটা কি তিনি জেগে থেকে শুনছেন, নাকি স্বপ্নের মধ্যে দেখছেন।

তিনি বললেন, ওগো আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

এই প্রশ্নের তিনি কোনো জবাব পেলেন না।

স্ত্রীর শোকে তার দুই চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

নাদিম জানালার পর্দার পাশ থেকে ক্যাসেট রেকর্ডারটা সরিয়ে নিয়ে গেল।

তার মনে হচ্ছে, কাজ হয়ে গেছে। ওষুধের অ্যাকশন শুরু হবে কাল থেকে।

আপনারা শুনলে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, সত্যি পরের দিন থেকে নাদিমের বাবা আনোয়ার চৌধুরীর রূপ গেল বদলে। তিনি চাবি হাতে নিলেন। তাঁর সিন্দুক খুললেন। সিন্দুক ভর্তি টাকা আর টাকা। অনেক টাকা। এক মুঠো টাকা বের করে তিনি পকেটে রাখলেন। তারপর ডাকতে লাগলেন : নাদিম, নাদিম।

গলার স্বর শুনেই নাদিম বুঝতে পারল এ এক অন্য বাবা। মা বেঁচে থাকতেই বাবা কেবল এ রকম করে ডাকতেন। আহা, বাবা তখনও কিপ্টেই ছিলেন, কিন্তু এ রকম চরম কিপ্টেমিতে তখন তাকে পেয়ে বসেনি।

নাদিম বাবার কাছে এসে বলল, জি বাবা।

বাবা এক মুঠো টাকা বের করে দিয়ে বললেন, যা বাজারে যা। সবচেয়ে বড় মাছ, মুরগি, পোলাওয়ের চাল আর যা যা লাগে, নিয়ে আয়। আজ রাতে ভোজ হবে। নাদিয়া আর তার জামাইকেও খবর দিস।

নাদিম বাবার পায়ে সালাম করে বলল, জি আচ্ছা বাবা।

নাদিম টাকাটা পকেটে ভরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাবা এবার ডাকতে লাগলেন, নাদির নাদির।

বড় ভাই এলেন। জি বাবা।

শোন, ওয়ার্কশপে গাড়ি পড়ে আছে না? ছাড়ানো হচ্ছে না?

জি বাবা। আপনি টাকা দিচ্ছেন না বলে...

নে টাকা। এক দলা টাকা ধরিয়ে দিলেন বড় ভাইয়ের হাতে। যা গাড়ি নিয়ে আয়।

বড় ভাই বলল, বাবা, একজন ড্রাইভারও তো লাগে।

বাবা পুরোনো অভ্যাসে রেগে গিয়ে বললেন, কেন, ড্রাইভার লাগবে কেন? তুই চালাতে পারিস না?

পারি। তবে বাবা আমি তোমার মতিঝিল অফিসে না বসলে তো হাজার হাজার টাকা এদিক-ওদিক হয়ে যাবে। তার বদলে একটা গরিব মানুষের যদি চাকরি হয়...কত আর যাবে। আর তা ছাড়া, আজকাল মানুষ ড্রাইভার রাখে গাড়ি সব সময় পাহারা দেবার জন্যে, গাড়ি চালানোর জন্যে নয়। ঢাকা শহরে রোজ অন্তত ১০০টা গাড়ির পার্টস চুরি হয়।

ঠিক আছে, বেতন কিন্তু ৫ তারিখের পরে...আগে পৃথিবীটা যদি ধ্বংস হয় তো ভালো...

বড় ভাই বললেন, ঠিক আছে বাবা। বেতন ৫ তারিখের পরেই দেবেন। বেটা কয়েকদিন গাড়ি চালাক। বেতন পাবার আগেই স্বর্গে চলে যাবে। আর স্বর্গে গেলে ওখানকার ট্রেজারি থেকেই বেতনটা তুলে নিতে পারবে। আমাদের টাকা আর কমল না।

ঠিক আছে। যা। আর শোন, কথা কম বলবি। মানুষের কথারও একটা দাম আছে।

জি আচ্ছা বাবা।

বাবা এবার ডাকতে লাগলেন নাদিমের মেজ ভাইকে, নাসির নাসির।

মেজ ভাই এলেন।

বাবা বললেন, শোন। ঘরদোরের দিকে তো তাকানো যাচ্ছে না।

মা মারা যাবার পরে আপনি আর পেইন্টও করাননি, পর্দাও বদলাননি।

নে টাকা ধর। দামি দামি সব পর্দা লাগা। আর বাড়িঘরে চুনকাম করা।

চুনকাম করাব? নাকি প্লাস্টিক পেইন্ট? আরো কিছু দ্যান বাবা।

বাবা টাকা দিয়ে দিলেন।

নাদিম, নাদির, নাসিররা গিয়ে ভেতরে খবর দিল। ওষুধে কাজ হয়েছে। বাবার মধ্যে নাটকীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তিনি সিন্দুকের পাল্লা খুলেছেন। দুই হাতে

বিলি-বন্টন শুরু করেছেন।

দুই ভাবি দৌড়ে এলেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

বড় ভাবি বললেন, বাবা...

মেজ ভাবি বললেন, বাবা আমরা একটা কথা বলতে চাই।

বাবা বললেন, বলো।

বড় ভাবি হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, বাসায় দুজন লোক রাখা দরকার। একজন বাবুর্চি আরেকজন বুয়া। ঘরদোরগুলো একটু গুছিয়ে রাখবে।

বাবা বললেন, বাবুর্চি রাখো। ঘরদোর গোছানোর কোনো মানে হয় না। আবার তো এলোমেলো হয়ই।

মেজ ভাবি বললেন, একটা লোকের চাকরি তো হবে। ওর ছেলেমেয়েরা দোয়া করবে।

বাবা বললেন, বেতন কবে দিতে হবে?

মেজ ভাবি বললেন, ৫ তারিখের পরেই দেব। আগে দেব নাকি! দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে গেলে বেটা টাকা নিয়ে গিয়ে কী করবে?

বাবা বললেন, তাহলে রাখো। বেতন কিন্তু ৫ তারিখের পর।

নাদিম ভালোই বাজার করেছে। দেখা যাচ্ছে, হাতে টাকা থাকলে সে খরচ করতে পারে। তবে কিছু টাকা যে সরায়নি, তা নয়।

রাত্রিবেলা বাসায় বিশাল খাওয়া-দাওয়ার উৎসব শুরু হয়েছে। রান্নাবান্নার দায়িত্ব ফখরুদ্দিন বাবুর্চির হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আজকে রাতের জন্যে। তারাই থালা-বাসন ধোওয়ার কাজও করছে। কাল থেকে নতুন বাবুর্চি ও বুয়া পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আপা চলে এসেছেন তার ছেলে ম্যাডোনা, বয়স ৪, আর জামাইকে নিয়ে।

নাদিম, বড় ভাই, মেজ ভাই, দুলাভাই, আর বাবা খাচ্ছে। ভাবিরা খাওয়ার তদারকি করছেন।

মানুষের খাদ্য গ্রহণের সময় বিচিত্র শব্দ হয়। হাপুস-হুপুস, চুকচুক, চপাস চপাস। হচ্ছে।

নাদিয়া আপার সঙ্গে তার ছোট্ট বাচ্চা ম্যাডোনা (৪ বছর) এসেছে। আপা ছেলেকে তুলে তুলে খাওয়াচ্ছেন।

ফ্রিজের কাছে একটা ছোট টেবিলে কোল্ড ড্রিংস রাখা গেলাসে গেলাসে।

আপা বললেন, ম্যাডোনা খাও বাবা। শোন, গল্প বলি। ৫ তারিখে না দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

ধ্বংস হয়ে যাবে মানে কী?

ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

সব কিছু ভেঙে যাবে?

হ্যাঁ।

ম্যাডোনা টেবিলের গ্লাস নিয়ে ভাঙতে লাগল।

আপা বললেন, করিস কী?

ম্যাডোনা বলল, ৫ তারিখে তো মা এমনিই ভাঙবে।

তা অবশ্য ঠিক। বাবা বাবা শুনেছেন আপনার নাতির কত বুদ্ধি। ৫ তারিখে দুনিয়াটা ধ্বংস হবে শুনে ও মনের সুখে গ্লাস ভাঙছে।

বাবা বললেন, তাতে তুই হাসছিস কেন?

আপা বললেন, ওর বুদ্ধি দেখে। খুব বুদ্ধি না বাবা?

বাবা কললেন, তা ৫ তারিখে সব ধ্বংস হবে বলে আমার মাথাটা ভাঙ। ভাঙবি।

আপা বললেন, বাবা রাগ করছেন কেন? বাচ্চা ছেলে একটা গ্লাস ভেঙেছে। খুশি হন।

বাবা বললেল, বললাম তো আমার মাথা ভাঙ।

ম্যাডোনা তীব্র গলায় কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি নানা ভাইয়ের মাথা ভাঙব। না হলে ভাত খাব না। আমি নানা ভাইয়ের মাথা ভাঙব।

আপা বললেন, চুপ।

ম্যাডোনা কেঁদেই চলেছে, আমি নানাভাইয়ের মাথা ভাঙব।

আপা চড় মারলেন তার গালে।

ম্যাডোনা তখনও কাঁদছে। আমি নানাভাইয়ের মাথা ভাঙব...

আপা তাকে আরেক চড় মারলেন। বললেন, চুপ চুপ... উদ্যত মারের ভয়ে সে চুপ করল। আপা প্লেট রাখতে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

এই সুযোগে ম্যাডোনা প্রতিশোধ নিতে লাগল। সে গোপনে কোল্ড ড্রিংকস রাখা প্রত্যেকটা গেলাসে একদলা করে থুতু দিয়ে রাখল। মামারা খাবে। নানাভাই খাবে। খা। আমার থুতু খা।

নাদিমের মনটা খুবই খারাপ। বউ বিয়ে দিয়ে যে ব্যক্তি জামাই ঘরে এনেছে, কেবল সেই বুঝবে এই দুঃখের মর্ম। অন্যেরা বুঝবে না, বোঝার চেষ্টা করতে পারে বটে।

নাদিম পছন্দ করে সিমিকে। অথচ সিমির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

সিমি ফোন করল নাদিমকে।

নাদিম ধরল।

সিমি বলল, শোন, তোরা তো কিছু করতে পারলি না, হাবলু কোথাকার। বাবাই আমার জন্যে জামাই ঠিক করে ফেলেছেন।

কংগ্রাচুলেশন্স।

জামাইটা লম্বায় তেমন না। দাঁতটা একটু উঁচু। তবে টাকা-পয়সা আছে।

তাইলে আর কী? পুরুষ মানুষের চেহারা লাগে না।

আর বয়সটা একটু বেশি।

বটগাছের আবার বয়স কী রে।

তবে হ্যাঁ। বেটাচ্ছেলে বড়লোক আছে। মার্সিডিজ বেঞ্জ ছাড়া চড়ে না।

কী ছাড়া চড়ে না?

মার্সিডিজ!

ওটা কী?

জানিস না কী?

গাড়ি?

আলবত।

এই আমাকে একদিন তোর জামাইয়ের গাড়িতে চড়াস তো। শালা আমি না কোনোদিন ওই গাড়িতে চড়ি নাই। আর নামটাও কেমন না? মার্সি দিস। এই শোন আমাকেও খানিকটা মার্সি দিস। একদিন তোর জামাইয়ের গাড়িতে চড়ে আমরা দুজন ফুসকা খেতে যাব। কলাবাগানের মোড়ের ফুসকাটা না জোশ।

ধেত্তেরি তুই ফাজলামো করছিস। আমার বলে বুক ফেটে কান্না আসছে।

কেন?

কালকে আমার বিয়ে না?

বিয়ে তো খুশিতে লাফা।

না। মেয়েরা বিয়ের আগের দিন কাঁদে। এটা নিয়ম। আমি কাঁদছি।

কাঁদ। কাঁদ। এই শোন। দুই ছটাক বেশি কাঁদবি। ওই দুই ছটাক আমার জন্যে। আমারও কান্না পাচ্ছে। কিন্তু কেমন করে কাঁদি বল। কাউকে বললে হাসবে না? সিমির বিয়ে তো তুই কাঁদিস কেন? আমি কি মেয়ে? মমতাজ বেগম? কাঁদব? বলব, বুকটা ফাইটা যায়। বন্ধু যখন বউ লইয়া রঙ্গ কইরা আমার বাড়ির সামনে দিয়া হাঁইটা যায়, কলজা ফাইটা যায়...

নাদিম ভেবেছিল, এই গান শুনে সিমি আগের মতোই ক্ষেপে যাবে। এই গানটা সে দুই কানে শুনতে পারে না। কিন্তু তার বদলে সে ফোনে শুনতে পেল ভেউ ভেউ শব্দ।

গান শুনে সিমি সত্যি কেঁদে ফেলেছে? মুশকিল হলো তো। কান্না জিনিসটা সংক্রামক, সিমি জানে না?

এখন তো নাদিমের নিজেরই কান্না পাচ্ছে। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল জানালা দিয়ে, নিচের রাস্তায় তাকাল। হে আল্লাহ আমার কান্নাটা থামিয়ে দাও। ওই ওখানে চঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে। তাকে কাঁদতে দেখলে সে এটাকে একটা আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত করে ছাড়বে। হে আল্লাহ সিমির বিয়ে যদি তুমি ঠেকাতে নাও পারো, আমার চোখের পানিটা অন্তত ঠেকাও।

আল্লাহতালা নাদিমের প্রার্থনা কবুল করলেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেল না। নাদিমের দুচোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। সে অতিকষ্টে রোদন দমন করে বলল,

সিমি, এই টেলিফোনের কসম। ওই দাঁত উঁচু বেঁটে লোকের সাথে তোর বিয়ে হয়ে যাবার আগেই আমি এসে যাচ্ছি, ইয়া আলি, ঢিসুম, ঢিসুম...

মানে কী?

আরে মানে বুঝলি না?

বুঝেছি।

কী?

তোর স্ক্রু পড়ে যাচ্ছে।

আরে না। আমি আসছি বাংলা সিনেমার নায়কের মতো। শেষ মুহূর্তে। এসেই ঢিসুম ঢিসুম করে ওই ভিলেনটাকে ধরাশায়ী করে তোকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে জিপের আগে আগে কাজি অফিসে পৌঁছে যাব।

খা। স্বপ্নেই পোলাও খা। আমি বিউটি পার্লারে যাচ্ছি। হাতে মেহেদি দেব।

## ৭

মে মাসের তিন তারিখ। পৃথিবী ধ্বংস হতে আর মাত্র একদিন বাকি। চারদিকে এই এক আলোচনা। এই এক বিষয় নিয়েই হৈচৈ। মসজিদ মন্দির গির্জায় ভিড় বেড়ে গেছে। চারদিকে ধুম পড়ে গেছে বিয়ে করবার। লোকজন সব ছুটিছাটা নিয়ে ছুটছে যার যার বাড়ির দিকে।

অফিসের বড়কর্তা বলছেন, ছুটির দরখাস্ত করেছেন, কেন?

স্যার। বাড়ি যাব স্যার।

কেন? বাড়ি যেতে হবে কেন?

বউ-বাচ্চার সাথে মরতে চাই স্যার।

৫ তারিখে মারা যাচ্ছেন, আপনি শিয়োর!

জি স্যার। শুধু আমি না, এই সৌরজগতই ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমাদের এই অফিসটাও ধ্বংস হয়ে যাবে?

যাবে স্যার। নগর পুড়ে গেলে পাপালয় কি এড়ায়?

কী বললেন?

বলছিলাম কি নগর পুড়ে গেলে দেবালয় কি এড়ায়?

না। এড়ায় না।

তাহলে এই অফিসটাও তো ধ্বংস হচ্ছে স্যার।

তাহলে আপনার ছুটির দরখাস্ত আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান?

কেন?

পরশু যদি দুনিয়াটা ধ্বংসই হবে, তাহলে আর ছুটিই কী? আর অফিসই কী? আর ধ্বংসই কী?

নাদিমদের বাসায়ও চলছে আসন্ন শেষ প্রলয়ের বিশেষ প্রস্তুতি।

বাসার সব সদস্য উপস্থিত। বাবা তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে দিচ্ছেন।

তিনি সিন্দুক থেকে একটা বড়সড় গয়নার বাক্স বের করে হাতে ধরে খুললেন। ই মা কত গয়না। দুই ভাবির চোখ ধাঁধিয়ে যাবার জোগাড়।

বাবা বললেন, তোদের মার গয়না। নে। তোরা ভাগ করে নে।

আপা বললেন, আপনিই দেন বাবা।

বাবা উদার হাতে গয়নাগুলো ধরে দুই বউ আর মেয়ের হাতে দিলেন ভাগ করে। তার হাতের নড়া-চড়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে, অসীম বৈরাগ্য কাজ করছে তার ভেতরে। এ সব জিনিসে তার আর কিছুই যায় আসে না।

মেজ ভাবি বললেন, বাবা। নাদিমের বউয়ের জন্যে?

বাবা বললেন, ওর তো বউ নাই।

বড় ভাবি বললেন, বাবা, আপনি বললেই ওর বউ নিয়ে আসা যাবে।

বাবা বললেন, নিয়ে আসো। গয়না দেব। কিন্তু কবে আর আনবে। দুনিয়া তো আর আছে দুই দিন। নাও তোমরাই সব ভাগ করে নাও।

মেজ ভাবি বললেন, বাবা। আপনার জীবনের সব কর্তব্যই তো আপনি করে গেছেন। দুই ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। নাতি-নাতনী বউদের মুখ দেখেছেন। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। শুধু একটা কর্তব্যই বাদ থেকে যাচ্ছে। ছোট ছেলেকে বিয়ে দেওয়া। পরশু দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেলে বেহেশতে গিয়ে মার দেখা পাবেন। মা আপনাকে বলবে, ওগো আমার ছোট ছেলেটার বিয়ে কেন তুমি দাওনি, তখন কী বলবেন?

বাবা বললেন, ছোট ছেলেটার বিয়ে কেন তুমি দাওনি? বিয়ে কী দেব? ও তো বেকার। ও বউকে খাওয়াবে কী?

বড় ভাবি বললেন, বাবা, আর মাত্র দুটো দিন তো বাবা। এই দুদিনে বউ আর কয় সের চাউল খাবে। কোনো ব্যাপারই না বাবা। আপনি রাজি হয়ে যান।

বাবা বললেন, না দুই সের চাউলও আমি অপচয় করতে পারি না। নাদির নাসির ইনকাম করে। খায়। বউকে খাওয়ায়। ও করুক।

তাহলে বাবা আপনার বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দেন বাবা।

বাবা রেগে গেলেন। বলল একটা কথা। বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দেন। দেন বললেই দেওয়া যায়।

বড় ভাবি বললেন, বাবা, দুই দিন পরে যখন আপনি আমি কেউ থাকব না, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে আপনি কী করবেন? আর তা ছাড়া শুনেছি, পরকালে যার যার জমিজমা সম্পত্তি তাকে তাকে ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে হয় হিসাব বুঝিয়ে দেবার জন্যে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। কাজেই ভাগাভাগি করে দেন। আপনার ঘাড়ের বোঝা কমে যাবে।

মেজ ভাবি বললেন, জি বাবা। প্লিজ। প্লিজ।

আপা বললেন, ওরা ঠিকই বলেছে। আপনার ব্যবসা দোকান এসব আজই ভাগ করে দেন। পরশু তো দুনিয়া ধ্বংসই হচ্ছে।

বাবা বললেন, ঠিক আছে। কাওরানবাজারের দোকান নাদিরের, মতিঝিলের ইনকাম নাসিরের, নয়াবাজারের আড়ত নাদিমের।

আপা কাঁদ কাঁদ গলায় বললেন, বাবা আমার?

বাবা হাত ঝেড়ে বললেন, মগবাজারের বাড়ি তোর, যা।

ওয়াও।

তখন সবাই একযোগে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বাবার পায়ে। তারা কদমবুসি করছে। বাবা, তুমি এত ভালো। জানতাম না।

চারদিকে থ্যাংক ইউ বাবা থ্যাংক ইউ বাবা রব। ছেলেমেয়েদের আনন্দ দেখে বাবার চোখে পানি এসে গেল। সত্যিই, এতদিন কিপ্টে ছিলেন বলেই না আজকে ছেলেমেয়েরা বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো খুশির জোয়ারে ভাসতে পারছে। কিপ্টে থাকাটা একেবারে বৃথা যায়নি।

নাদিম তাদের গাড়িটা নিয়ে বের হয়েছে। তার পকেটে মুঠো মুঠো টাকা। সে প্রথমে গেল একটা দামি ব্যাঙ্কে। এখানে তার একটা বন্ধু আছে। তাকে বলল, দোস্তো, এই টাকাগুলো রাখব, একটা একাউন্ট খুলে দাও। আর ১৫ মিনিটের মধ্যে একটা ক্রেডিট কার্ড করে দাও দিকিনি।

বন্ধু বলল, ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কী করবি?

নাদিম বলল, এটা কী ধরনের প্রশ্ন করলি। ক্রেডিট কার্ড দিয়ে লোকে কী করে?

ধারে জিনিস কেনে?

আমিও ধারে জিনিস কিনব। আগামীকাল বা পরশু যদি দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যায়, লোনটা আর শোধ করতে হলো না। কিন্তু মনের শখ তো পূরণ করা হয়ে গেল।

তা অবশ্য ঠিক বলেছিস। নে এই কাগজটায় একটা সাইন কর।

এক ঘণ্টার মধ্যেই ক্রেডিট কার্ড হাতে এসে গেল তার। সেটা নিয়ে একটা মার্কেটে গেল প্রথমে। রেডিমেট প্যান্ট-শার্ট কিনল খুব দামি দোকান থেকে। দামি জুতা কিনল। ক্রেডিট কার্ডে দাম শোধ করল। তারপর গেল একটা মোবাইল ফোনের দোকানে। একটা প্রিপেইড মোবাইল ফোন কিনল তক্ষুনি তক্ষুনি। এবার সে ঢুকল একটা গয়নার দোকানে। একটা হিরের আংটি দিন দেখি।

এ দোকানে তো হিরের আংটি নাই।

কোন দোকানে আছে?

নাদিম হিরের দোকানে গিয়ে কিনল হিরের আংটি।

মার্কেট থেকে বেরিয়ে ড্রাইভারকে বলল, সিমিদের বাড়ি।

স্যার?

ধানমন্ডি।

বাসার সামনে গিয়ে গাড়ি পার্ক করিয়ে হর্ন বাজাল। তারপর নেমে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ফোন করতে লাগল।

নাদিম বলল, হ্যালো সিমি?

সিমি বলল, কে?

আমি নাদিম।

মোবাইল কার?

আমার।

এই শোন। তুমি একটু নিচে আসো।

সিমি দৌড়ে নিচে নামল। বাসার সামনে গাড়ির বনেটে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোন হাতে, ছেলেটা কে?

এ তো দেখছি চলমান ফ্যাশন শো।

সিমি বলল, আরে আরে এ কোন নাদিম?

তোমার পুরোনো ভক্ত। নতুন বোতলে পুরোনো মদ।

বাপরে দারুণ লাগছে।

শোন তোমার জন্যে একটা ছোট্ট গিফট এনেছি। এ লিটল গিফট ফর ইউ।

দেখি কী?

নাদিম আংটিটা বের করল। হাতে দিল সিমির।

বলল, ডায়মন্ড। খাঁটি হিরা।

ব ব ব বলো কী? হিরা।

হ্যাঁ, সোনার হাতে হিরার আংটি কে কার অলংকার।

দাও পরিয়ে দাও।

আমি পরিয়ে দেব? ওই মার্সিডিজওয়ালা কী ভাববে?

ভাবুক। ভেবে ভেবে মরে যাক। আমার কী?

বেটা মরলে কী আর করব। কুলখানি খাব। কিন্তু আমাকে মারার জন্যে লোক পাঠিয়ে দেয় যদি।

ওমা। ফাইট করবে। পারবে না।

ভয় লাগে।

ভয় কিসের। আমি তোমার সাথে আছি না।

আছো?

হ্যাঁ।

তাহলে ভয় পাই না, শয়তান, আজ আমি তোকে এমন মাইর দেব.. ঢিসুম...ঢিসুম...আমি তোকে এমন মাইর দেব তুই পানিও পাবি না। আর আমি তোকে পানি খাইয়ে খাইয়েই মারব। ইয়া আলি...

বাড়ির সামনে বাবা একটা বস্তায় খুচরো টাকা নিয়ে বসে পড়লেন।

এক এক করে ভিক্ষুক আসছে। আর তিনি টাকা দিচ্ছেন।

বাবা বললেন, নেন বাবা। দোয়া করবেন। এই ৫ তারিখটা যেন ঠিকভাবে পার হয়ে যায়।

ভিক্ষুক ভিক্ষা নিয়ে যাবার সময় দুহাত তুলে দোয়া করতে লাগল : আল্লাহ আবার কুনদিন এই ৫ তারিখ দিবা আল্লাহ। কিপ্টা আনোয়ার চৌধুরীও আজকা দেহি দানখয়রাত করে।

বাবা তাকে আবার ডাকলেন। এই এদিকে আসো। তিনি ভিক্ষুকের থালা থেকে টাকা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, এবার যাও।

ভিক্ষুক বলল, স্যার আজকা ১০ টাকা দিলে পরশুদিনই তো ৭০০ টাকা পাইবেন।

বলছ পাব।

জি। পাইবেন। আমি আদায় কইরা দিমু।

নাও তাহলে।

কে কয় স্যারে কিপ্টা। একরে দাতা মোহাম্মদ মহসিন। আসসালামু....

৩ মে রাত। কালকের দিনটা পার হলেই পৃথিবীর চির অবসান। কিছুই থাকবে না আর। আমি না, তুমি না। ফুল পাখি পাহাড় সমুদ্র না। টাকা না পয়সা না।

বাবার মনটা বড় নরম হয়ে আসছে। তিনি নিজের ঘর ছেড়ে বের হলেন।

বড় ভাইয়ের ঘরের সামনে গিয়ে নক করলেন।

বড় ভাবি দরজা খুললেন। ম্যাডোনা ঘুমুচ্ছে। বড় ভাই জেগে আছেন।

বড় ভাবি বললেন, আসেন বাবা।

বড় ভাই বললেন, জি বাবা আসেন।

বাবা বললেন, শোন মা । তোমাদের সাথে এতদিন খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দিও।

বড় ভাবি বললেন, কী বলছেন বাবা এসব।

বাবা বললেন, একটা কাজের লোক পর্যন্ত রাখতে দেইনি। তোমরা কত কষ্ট করেছ। ছেলেরা বাসে অফিসে গেছে। মাফ করে দিস রে নাদির।

বড় ভাবি বললেন, আপনিও মাফ করে দেবেন বাবা। অনেক খারাপ কাজ করেছি।

তোমরা আবার কী খারাপ কাজ করলে?

সেদিন যে আপনার পায়ে লেগে ফুলদানিটা ভাঙল, ওটা আসলে আমিই ভেঙেছিলাম, ভেঙে আপনার বিছানার পাশে এমন করে রেখে দিয়েছি যেন আপনি উঠলেই পড়ে যায়।

বলো কী?

মেজ ভাবি কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন, মাফ করে দেন বাবা।

দিলাম।

বড় ভাই বললেন, বাবা। আপনাকে না জানিয়ে অফিস থেকে মাসে মাসে টাকা সরিয়েছি। মাফ করবেন বাবা।

বাবা বললেন, না-না, ও তো তোদেরই টাকা। কোনো অপরাধ হয় নি।

মেজ ভাইয়ের ঘরে গেলেন বাবা।

দরজায় নক করে ঢুকে পড়লেন, বউমা ঘুমালে?

মেজ ভাবি বললেন, না বাবা। আসেন।

বাবা বললেন, মাফ চাইতে এলাম। তোমাদের এত কষ্ট দিয়েছি।

মেজ ভাবি বললেন, কী যে বলেন। আমরা কত ক্রাইম করেছি। এই তো সেদিন হালুয়ায় একটা ইঁদুর মরে পড়ে ছিল। আপনি বকবেন ভয়ে ফেলতেও পারি না। পরে ইঁদুরটা ফেলে দিয়ে হালুয়ায় গোলাপজল দিয়ে আপনাকে খাঁওয়ালাম। বললাম, বাবা, এটা হলো গোলাপি হালুয়া। আপনি খুশি হয়ে সবটা খেয়ে নিলেন।

বাবা ওয়াক তুললেন। এই বুঝি বমি করে দেন তিনি।

মেজ ভাবি বললেন, বাবা ক্ষমা করে দিন। কালকের দিনটাই তো কেবল বাঁচা।

বাবা বললেন, কালকের দিনটাই তো বাঁচা। ক্ষমা করে দিলাম।

মেজ ভাই বললেন, বাবা আপনার দোকান থেকে টাকা সরিয়ে রোজ দুপুরে বিরিয়ানি খেয়েছি।

বাবা বললেন, খাবি তো। সব তো তোদেরই টাকা।

মেজ ভাই বললেন, তাহলে বাবা আশুলিয়ায় যে একটা জমি কিনেছি তাতেও কোনো অপরাধ নেবেন না।

বাবা বললেন, যাহ নিলাম না।

চঞ্চল ঘুমিয়ে ছিল, তাই তো মনে হচ্ছিল, হঠাৎ মাথা তুলে বলল, আর দাদা ভাই আমরা যে তোমাকে আড়ালে কিপটা শকুন ডাকি তাতেও কোনো অসুবিধা নাই। মাফ করে দিও।

মেজ ভাবি আর ভাই বললেন, এই চুপ। বানিয়ে কথা বলিস না তো।

চঞ্চল বলল, না বানিয়ে বলছি না। সত্য বলছি। কালকেই তুমি বলেছ কিপটা শকুন। আর বাবা বলেছে চিপ্টা কঞ্জুস।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা ঘর ছাড়লেন।

ডাইনিং চত্বরটা পার হচ্ছেন। দেখলেন, বুয়া মেঝেতে ঘুমাচ্ছে। তিনি কাছে গেলেন। নরম সুরে ডাকলেন। বুয়া তোমরা কি মেঝেতে ঘুমাও। ছি ছি। মানুষে মানুষে এত ভেদ। ওঠো। আসো।

বুয়াকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরের দরজা খুলে দিলেন তিনি। চমৎকার একটা গেস্ট রুম। দুধ-সাদা বিছানা।

বাবা বললেন, এই ঘর তোমার। বিছানায় শোবে। যাও।

বুয়া বলল, আপনে মানুষ না। আপনে ফেরেশতা। আল্লাহ আপনাকে জান্নাত দিবে।

বুয়া বাবার পায়ে সালাম করল।

মেজ ভাই মেজ ভাবি বাবার ব্যবহারে বেশ খুশি। বাবা নিজে মাফ চেয়েছেন আবার তাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন। এবার নাদিমের জন্যে একটা কিছু করা দরকার।

মেজ ভাবি বললেন মেজ ভাইকে, শোন, নাদিম একটা আব্দার নিয়ে এসেছিল। ওর বন্ধু সিমির বাবা-মা নাকি সিমির বিয়ে দিয়ে দিতে চায়। দুনিয়া ধ্বংসের আগেই। ৪ তারিখে বিয়ে।

মেজ ভাই বললেন, অসুবিধা কী? যাব দাওয়াত খেতে। বাবা তো এখন বিয়ের গিফট কেনার টাকা দিতে আপত্তি করবেন না।

আরে বুদ্ধু। তোমাকে দাওয়াত খেতে যেতে হবে না। শোন। আমাদেরও তো একটা শখ আছে নাকি! আমার শখ মরার আগে নাদিমের বউ দেখে যাই।

দি আইডিয়া। বাবা তো রাজি হয়েছেনই। নয়াবাজারের আড়ত দিলেন না ওকে।

কমিউনিটি সেন্টার কি পাওয়া যাবে। সবাই ৪ তারিখের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। খুব ডিমান্ড।

পাওয়া না গেলে তো আরো ভালো। বাবার টাকা বেঁচে যাবে।

চলো তাহলে ওদের বাসায় প্রস্তাব নিয়ে যাই। অনুষ্ঠানের দরকার নাই। কাজি ডেকে বিয়ে।

তারপর সোজা বাসরে। তুমি এক কাজ করো বাসর সাজাও।

মেজ ভাবি বাসরঘর সাজিয়ে ফেললেন। তারপর সবাই মিলে চলে গেলেন সিমিদের বাসায়। ৫ তারিখে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। হাতে আর সময় নাই। ৪ তারিখ সন্ধ্যার মধ্যে বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে। ১২টা বাজার আগেই তাদের বাসর ঘরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। বলা তো যায় না, ৪ তারিখ রাত ১২টা পার হলেই তো ৫ তারিখের জিরো আওয়ার। তখনই হয়তো দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে গেল। তার আগেই নাদিম আর সিমির বাসরটা হোক।

সিমি আগেই ওর বাবাকে বলে রেখেছিল। বাবা, আমি পাত্র পেয়ে গেছি।

সিমির বাবা বলেছিলেন, তা হলে ওই পাত্রটার কী হবে?

সিমি কাঁদ কাঁদ স্বরে বলেছিল, বাবা, দুনিয়াটা ধ্বংস হবার আগে আমার একটা শখ তুমি পুরা করবে না বাবা। আমি নাদিমকেই বিয়ে করতে চাই।

বাবা বলেছিলেন, ঠিক আছে। ঠিক আছে। আর নাকি কান্না কাঁদতে হবে না।

সিমি ফোন করে খবর দিল নাদিমের মোবাইলে। এই তাড়াতাড়ি চলে আয়। সময় বয়ে যায়।

তাড়াহুড়ো করে কাজি ডেকে বিয়ে পড়িয়ে পোলাও রোস্ট খেয়ে-দেয়ে সিমিকে নিয়ে ওরা চলে এলো এই বাড়িতে।

সময় বেশি নাই। রাত বেজে গেছে ১১টা।

এই ওদেরকে বাসর ঘরে ঢুকিয়ে দাও।

ব্যাস। বাসরঘরে নাদিম আর সিমি বাকবাকুম করা শুরু করে দিল।

নাদিম বলল, কেমন দেখলাম।

সিমি বলল, হেভি।

আর কিছুক্ষণ পরে ১২টা বাজবে। ৫ তারিখ। দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

ওগো না। আমার এখন অনেক দিন বাঁচতে ইচ্ছা করছে। কিছু হবে না।

এক কাগজে লিখেছে ঠিক ১২টায় ধ্বংস হবে। আরেক কাগজে লিখেছে ধ্বংস হবে না।

১২টা বাজছে। তুমি আমার হাত ধরে থাকো।

এই তুই আমাকে তুমি তুমি করে বলছিস কেন?

এই বুদ্ধু। তুমি আমার বর না। বরকে কেউ তুই তোকারি করে?

ও তাই তো। দাও হাতটা ধরি।

নাদিম হাত ধরল সিমির, তার হাত থরথর করে কাঁপছে।

সিমি বলল, কী ব্যাপার কাঁপছ কেন?

কই কাঁপছি নাকি? মনে হয় দুনিয়াটাই কাঁপতে শুরু করেছে।

৪ মে। রাত ১১টা ৫৯। আর একটা মিনিট পরে দুনিয়ার চির অবসান। বাবার সামনে বাবুর্চি। বাবা বললেন, ভাই তুমি মেঝেতে কেন। উঠে আসো। আমার বিছানায় বসো।

১২টা বেজে গেল। ১২টা একমিনিট।

এই সেই ৫ মে।

না। এখনও দুনিয়া ধ্বংস হয় নাই। তবে বলা যায় না। আরো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনো সময় হয়ে যেতে পারে।

নাদিম বলল সিমিকে, ১২টা ৫ বেজে গেল, কই কিছু তো হলো না।

সিমি বলল, মনে হয় বেঁচেই গেলাম। ভাগ্যিস তোমাকে বিয়ে করেছিলাম। তবু তোমার সাথে অনেক দিন থাকতে পারব। ওই লোকটার সাথে বিয়ে হলে তো আজ সত্যি সত্যি ডুম'স ডে হয়ে যেত।

আমার মনে হয় দুনিয়াটা ধ্বংস হবে না। মাঝখান থেকে আমাদের বিয়েটা হয়ে গেল। তোমাকে একটা গান শোনাই। মান্না দের গান। শুধু একদিন ভালোবাসা, মৃত্যু যে তারপর, তাও আমি চাই। চাই না বাঁচতে আমি প্রেমহীন হাজার বছর। তোমার বুকে মাথা রেখে মরতে পারব। সে মরণেও যে সুখ।

সিমি বলল, এই রে। দুনিয়াটা কেমন পাক খাচ্ছে না। মনে হয় শুরু হয়ে গেল।

নাদিম ভয় পেয়ে গান বন্ধ করে দিয়েছে।

সিমি হাসতে হাসতে বাঁচে না। বললে না মরণে সুখ। কই। সুখ তো দেখলাম না তোমার চোখে।

৮

৫ তারিখ ভোর হলো। সূর্য উঠল। ঝলমলে সূর্য। কোথাও দুনিয়া ধ্বংসের কোনো লক্ষণ নাই। তবু লোকজন ভয়ে সেঁধিয়ে রইল। রাস্তাঘাট ফাঁকা ফাঁকা। অফিস-আদালতে লোক কম। স্কুল-কলেজ ছুটি।

সারাটা দিন বাবা কাটালেন গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে। বাবুর্চিকে বসালেন ডাইনিং টেবিলে। এক সাথে তার সঙ্গে খেলেন। সবার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বললেন। তার হাতে সংবাদপত্র। তাতে বড় করে লেখা : আজ সেই মহাপ্রলয়ের দিন।

নাদিমের বউ সিমি তার জন্যে চা করে নিয়ে গেল।

তিনি বললেন, বাহ্। গাধাটা তো একটা চমৎকার মেয়ে জোগাড় করেছে। ভালো করেছে। কী আর করবে মা, তোমাদের দাম্পত্যটা হবে কয়েক ঘণ্টার। কখন যে দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যায়। যাও মা। নাদিমের কাছে যাও। ওর সাথে গল্প করো।

৫ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট। বাবার ঘরে তার বিছানায় বসে আছে বাবুর্চি।

বাবা ভাবলেন, এই এক মিনিটেই দুনিয়াটা শেষ হয়ে যাবে। আর মাত্র একটা মিনিট।

ঢং ঢং ঢং।

দেয়াল ঘড়িতে ১২টা বাজল।

আজ ৬ তারিখ।

দুনিয়াটা ধ্বংস হয় নাই। আমরা বেঁচে আছি।

সবাই বেঁচে আছি।

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে লোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আনোয়ার চৌধুরীর বাসার সদস্যরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মুখ লুকিয়ে হাসতে লাগল। বিপদ কেটে গেছে, বাবাও কিপ্টেমি ত্যাগ করেছেন।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আরেক। বাবা মুখ খুললেন, কইরে ৫ তারিখের বদলে তো ৬ তারিখ হয়ে গেল। ঘটনা তো কিছু ঘটল না। এই গর্দভ, তোর এত বড় সাহস তুই আমার বিছানায় বসেছিস। ওঠ। ওঠ।

গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন বাবুর্চিকে।

বাবুর্চি অবাক। এই লোককে তার একটু আগে মনে হচ্ছিল ফেরেশতা, এখন মনে হচ্ছে একটা পাষণ্ড বড়লোক।

তারপরে বাবা গেলেন গেস্ট রুমে। দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন জোরে জোরে।

বুয়া বলল, কেডা অমন কইরা দরজা ধাক্কায়। ডাকাইত নাকি?

বাবা বললেন, বুয়া বুয়া। এই কাজের লোকের এত বড় সাহস। একটা ঘর দখল করে আছে। যাও। রান্নাঘরের পেছনে যাও।

বুয়া পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল : বড়র পিরিতি বালির বান্ধ, এই দড়ি এই চান্দ।

সিমি খুব খুশি। ৫ তারিখ পেরিয়ে গেছে। দুনিয়াটা তো বহাল তবিয়তে রয়ে গেছেই, মধ্যখান থেকে নাদিম বড়লোক হয়ে গেল, নাদিমের সঙ্গে তার বাবা-মা তার বিয়েতে রাজি হলো, বিয়ে হয়ে গেল, বাসর হলো, কিন্তু তারা চমৎকারভাবে বেঁচে আছে। এখন একটা হানিমুনের ব্যবস্থা করলেই হয়ে গেল।

সিমি বলল, পত্রিকাওয়ালাদের একটা লেটার অফ থ্যাংকস দিতে হবে। বুঝলে।

নাদিম বলল, কেন?

ওরা বানিয়ে বানিয়ে প্রলয়ের খবর দিয়েছিল বলেই না তোমার আমার বিয়েটা এত তাড়াতাড়ি হতে পারল। না হলে তুমি যা অলস ছিলে তোমাকে দিয়ে কিছুই হতো না।

কথা অবশ্য তুমি খারাপ বলো নি। পত্রিকাগুলো ব্যবসা করতে গিয়ে অজান্তে আমাদের পরম উপকারও করে দিয়েছে।

এই, হানিমুনে কোথায় যাবে?

তুমি বলো।

হনুলুলু।

সেটা আবার কোথায়? এই হনুলুলু টুলুতে যাবার দরকার কী?

তাহলে সুইজারল্যান্ড।

আচ্ছা। সুইজারল্যান্ড। তোমার বাবার একটা ট্রাভেল এজেন্সি আছে না। ওদের কাছ থেকে টিকেট কিনে নেব।

ঘটনা কী? তুমি মনে হচ্ছে আবার কিপ্টে হয়ে যাচ্ছ।

না। তা কেন? এখন আমার ব্যবসা আছে। তোমার গয়না আছে। ঘরে সুন্দরী বউ আছে। আমি কেন কিপ্টে হব?

দেখো কিন্তু। কিপ্টে লোকের সংসার কিন্তু আমি করব না।

না না। তা কেন করবে।

বাবা ঘুমুতে গেলেন। কিন্তু তার ঘুম আসছে না। কাল সকালেই আসবে হকারওয়ালা, পত্রিকার বিল নিতে। আসবে ড্রাইভার, বাবুর্চি, বুয়া, সবার বেতন। হায় আল্লাহ এ কোন গজবের মধ্যে পড়লেন তিনি। রাগে-দুঃখে তিনি নিজের হাত নিজেই কামড়াতে লাগলেন।

রাত কোনো রকমে ভোর হলো।

টুংটুং। হকার পত্রিকা দিয়ে গেল।

বাবা পেপার নিতে দৌড়ে গেলেন। কিন্তু তার আগেই সিমি পেপারটা কুড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল।

বাবা বললেন, এই আমার পেপার পড়ো, তুমি কে?

আমি... বাবা... আমি সিমি।

সিমি কে?

নাদিমের বউ।

নাদিম কে?

আপনার ছেলে।

ওই গর্দভটা?

আপনার ছেলে...

ও নাদিম গর্দভটা তো আবার বিয়ে করেছে। ইনকাম নাই কিছু নাই। বিয়ে করেছে। পেপারটা দাও।

আপনি আমার সঙ্গে এরকম করে কথা বলছেন কেন? সিমি কাঁদ কাঁদ।

আচ্ছা বাবা কাঁদতে হবে না। তুমিই পড়ো।

নেন। আপনিই পড়েন। সিমি চোখ মুছতে মুছতে নাদিমের ঘরের দিকে গেল।

বাবা পত্রিকা নিয়ে হতবাক। তিনি ভেবেছিলেন, এতদিন ভুয়া খবর দেবার জন্যে পত্রিকাটা মাফ চাইবে। কিসের কী? বরং লাল কালিতে ব্যানার। দুনিয়া ধ্বংস হয়নি। জনমনে স্বস্তি। এই ধরনের ভুয়া কাগজ পড়ার মানে হয় না। কালকেই হকারকে বলে দিতে হবে যেন খবরের কাগজ আর বাসায় না দেয়।

নাশতার টেবিল। সবাই বসেছে নাশতা খেতে। টেবিল ভরা খাবার-দাবার। বাবা এত খাবার দেখে ভীষণ রেগে গেলেন।

এই এত খাবার কেন? অপচয় করা ঠিক না। দাও আমাকে একটা টোস্ট বিস্কুট দাও। আর কিছু না। আর কাজের লোকগুলোকে সব বিদায় করো। আমি হাজি মুহম্মদ মুহসিন নাকি?

মেজ ভাই বললেন, বাবা। আপনিই না এই নাশতা চালু করেছেন।

বাবা বললেন, আমি করেছি। কক্ষনো না।

বড় ভাই বললেন, বাবা মতিঝিলের অফিসে কিন্তু বাবা মালিক হিসেবে আমার নাম দিয়ে দিয়েছি।

বাবা বললেন, কেন? তুমি কেন ওটার মালিক হবে। ও তো আমার। আমি তো এখনও মরে যাই নি।

বড় ভাই বললেন, সে কি বাবা, ওটা না আমাকে দিয়ে দিলেন?

বাবা বললেন, এখন বলো, কাওরানবাজার, পুরান ঢাকা সব নাসির নাদিমকে

দিয়ে দিয়েছি।

মেজ ভাই হেসে বললেন, জি বাবা আপনি তাই করেছেন।

বাবা বললেন, নাহ। হতেই পারে না।

মেজ ভাই বললেন, হ্যাঁ বাবা আপনি না বললেন সেদিন।

বাবা বললেন, বলেছি নাকি? বললে ইয়ারকি করে বলেছি। ধ্যেৎ তোমরা ইয়ারকিও বোঝ না মেজ ভাই বললেন, না বাবা সিরিয়াসলি দিয়েছেন।

বাবা বললেন, না হতেই পারে না।

সবাই একযোগে বলে উঠলেন, হ্যাঁ বাবা দিয়েছেন।

তখনই বাবার বুকের ব্যথাটা আবার উঠল। তিনি বুকে হাত দিয়ে বাবা গো মাগো বলে চেয়ারে কাত হয়ে পড়ে গেলেন। সবাই ধরাধরি করে তাকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল।

নাদিম চিন্তায় চিন্তায় বাঁচে না।

বাবা আবার কিপ্টে হয়ে গেছেন।

আর সবাইকে ডেকে ডেকে বলছেন কিপ্টে হতে।

কাজের লোকদের সবাইকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। সকালবেলা আবার এক কাপ চা। দুটো টোস্ট বিস্কিট নাশতা চালু হয়েছে।

বাবা বড় ভাবিকে ডেকে বললেন, শোন। ফুলদানিটা তুমি ভেঙেছ, না? নতুন একটা কিনে এনে দাও।

বড় ভাইকে বলছেন, কী তুই আমার প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা-পয়সা সরাস। তোর আর ওইসব জায়গায় যাবার দরকার নাই। আমিই যাব, নিজে দেখব।

মেজ ভাবিকে ডেকে বললেন, তুমি আমাকে গোলাপি হালুয়া খাইয়েছিলে। তোমাকেও আমি ওটা খাওয়াব। দাঁড়াও আগে একটা মরা ইঁদুর পেয়ে নিই।

মেজ ভাইকে ডেকে বললেন, আমার টাকা দিয়ে রোজ বিরিয়ানি খাওয়া হয়, না! সব বন্ধ।

আর নাদিমকে বললেন, তুই হতভাগা বিয়ে করেছিস, না? মানুষের মেয়ে কি সস্তা হয়েছে। যা, যার মেয়ে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

বাবা, বিয়ে তো হয়ে গেছে। এখন ফিরিয়ে দেব কেমন করে!

কেমন করে মানে। রিকশায় চড়ে। যা ভাগ।

সিমি কাঁদছে। নাদিম পায়চারি করছে।

সিমি বলল, চলো আমরা আলাদা বাসা নেই।

অফকোর্স নেব। তবে টাকা-পয়সা তো তেমন নাই। ব্যাংকে কিছু রেখেছি। সে আর কত। এক মাসেই শেষ হয়ে যাবে।

এমন সময় দরজায় নকের শব্দ।

বাবা বলছেন, এই নাদিম। তোকে টাকা দিয়েছিলাম না। সব ফেরত দিবি।

এই দ্যাখো। কী বলে। আচ্ছা বাবা তুমি যাও। ফেরত দেব।

ফেরত দেবে? সিমি নাক ফুলিয়ে কাঁদছে।

দেব না। বুদ্ধি দাও।

আগের বুদ্ধিটাই তো ভালো।

কোনটা।

আপাকে দিয়ে রেকর্ড করিয়ে বাবাকে বলানো।

তাই তো...

৯

বাংলাদেশের অফিস-আদালত, কোর্ট-কাচারি, হাট-বাজার আবার স্বাভাবিক রূপ ফিরে পেতে লাগল। যে রাজনীতিবিদ ৪ তারিখে জনসভায় ভাষণ দিয়ে বলেছিলেন, ভাইরে আপনাদের টাকা-পয়সা মেরে দিয়ে এতদিন অনেক আত্মসেবা করেছি, মাফ করে দেবেন, ৫ তারিখের পরে বেঁচে থাকলে আর কোনোদিন জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন করব না, তিনি আবার পুরোনো রূপেই ফিরে গেলেন। কে বলেছে আমি জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করি, কার ঘাড়ে দুটো মাথা, আমার সামনে এসে বলুক। এই পৃথিবীর বুকে তার জায়গা নাই। যে আমলা ৪ তারিখে ঠিকেদারের হাত ধরে বলেছিলেন, ভাই রে, এ জীবনে বহু ঘুস খেয়েছি, আর খেতে চাই না, আজ তিনিই কন্ট্রাক্টরের সামনে ফাইল ছুড়ে মেরে বলছেন, এই ফাইল কার, আপনিই বলেন, এই বিল পাস করানো যায়? কন্ট্রাক্টর বলছে, স্যার, ৪ তারিখে আপনি কী বলেছিলেন আমার কিচ্ছু মনে নাই স্যার, আপনি নিশ্চিন্ত মনে বিলে সই করেন, আপনার পার্সেন্টেজ আগের মতোই থাকবে স্যার। যে লোক চালের মধ্যে কাঁকর মেশানো ছেড়ে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে আবার খুশি মনে কাঁকরের অনুপাত দ্বিগুণ করে দিয়ে শুরু করেছে মিশ্রণের কাজ। ড্রাইভার তেল চুরি করছে পাইপ লাগিয়ে, ট্রাফিক পুলিশ সখ্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে ট্রাক ড্রাইভারের দিকে, চারদিকে এক অনাবিল স্বাভাবিকতা। কোথাও কোনো গণ্ডগোল নাই, অস্বাভাবিকতা নাই। পকেটমার পকেট মারছে, ফেনসিডিল ব্যবসায়ী ফেনসিডিলের নতুন লট আমদানি করছে, চোর সিঁদ কাটছে, ছিনতাইকারী আবার ছুরি ধরছে পথচারীর বুকে, টিকেটের কালোবাজারি আবার ডিসি ডিসি বলে হেঁকে চলেছে সিনেমা হল চত্বরে। সবার মুখে হাসি। সবার মুখে বেঁচে থাকার আনন্দ। আজি কী আনন্দ আকাশে বাতাসে।

নাদিম ছুটল আপার কাছে। হাতে ক্যাসেট রেকর্ডার। কুকুরটাকে আগের কায়দায় বশ করে সে ঢুকে গেল ভেতরে। ম্যাডোনা তাকে বলে উঠল, নাদিম মামা, শুঁটকা গামা।

নাদিম তার গালে একটু আদর করে রওনা দিল আপার ঘরের দিকে।

আপা, বাবা তো আবার কিপ্টে হয়ে গেছেন।

সর্বনাশ। কী বলিস?

শুধু নিজে কিপ্টে হলে তো হতো। সবাইকে বলছেন জিনিসপত্র বিষয় সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে।

অ্যাঁ। কী বলিস। আমি আমার জিনিসপত্র ফিরিয়ে দিতে পারব না।

অবশ্যই পারবে না। দেবে না। মগের মুলুক নাকি। নাও। আরেকটা স্ক্রিপ্ট লিখে এনেছি। একটু ভয়েস দিয়ে দাও। রেকর্ড করে নিয়ে যাই।

আপা নাদিমের লেখা সংলাপটা পড়ে দিলেন। নাদিম রেকর্ড করে নিয়ে আপার বাসা থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুত।

রাত। বাবা ঘুমিয়ে। ক্যাসেট ছেড়ে দেওয়া হলো। দিল নাদিম। বাবার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শুনতে লাগলেন যেন তার স্ত্রী বলছে :

ওগো। দুনিয়াটা ৫ তারিখে ধ্বংস হয় নাই তাতে কী? তুমি যখন কিপ্টেমি ছেড়েছিলে, দানখয়রাত করেছিলে তখন কি তুমি মনে শান্তি পাও নাই? তখন কি বাড়িটা আগের মতো, আমি যখন বেঁচে ছিলাম তখনকার মতো হয়ে ওঠে নাই? টাকা-পয়সা নিয়ে কি তুমি কবরে কোথায় যাবে? যা আয় করেছ, তার ভালো ব্যবহারে মনে শান্তি আসে। বেশি অপব্যয় ভালো না। আবার কিপ্টেমিও ভালো না। মধ্য পথই শ্রেষ্ঠ পথ। নাদিমের বউয়ের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। মেয়ের জামাইয়ের সাথেও। মেয়েটা আমার বড় আদরের ছিল।

(শেষের বাক্য দুটো আপা নিজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন)

বাবা বললেন, ঠিক আছে গো। তুমি যখন বলছ।

অনেকক্ষণ তার চোখ ঘুম এলো না। তার মনে না না চিন্তা। না না প্রশ্ন। তিনি বুঝতে পারছেন না, আসলে তার কী করা উচিত। তার কি কিপ্টে হওয়া উচিত, নাকি উদার। তার কানে বার বার বাজতে লাগল তার স্ত্রীর পরামর্শ, বেশি অপব্যয় ভালো না। আবার কিপ্টেমিও ভালো না। মধ্য পথই শ্রেষ্ঠ পথ।

তিনি ঠিক করলেন, আগামীকাল থেকে তিনি মধ্য পথে চলবেন। ভালো হয়ে যাবেন।

সিদ্ধান্ত নেবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এক অভূতপূর্ব শান্তি দেখা দিল। তিনি প্রসন্ন চিত্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।

কিন্তু সকালবেলা তার রাতের সিদ্ধান্ত তিনি ভুলে বসে থাকলেন।

বাবা ঘুম থেকে উঠে বসার ঘরে এলেন।

সিমি এক কাপ চা আর পত্রিকা হাতে তার কাছে এলো। সবাই আড়ালে তাকিয়ে

আছে বাবা আর সিমির দিকে। আল্লাই জানে মায়ের বাণীতে কাজ হয়েছে কিনা।

সিমি বলল, বাবা এই যে আপনার পেপার আর এই যে চা।

বাবা বললেন, এই মেয়ে তুমি আমার পেপারে হাত দিয়েছ কেন? আমি ভেবে রেখেছিলাম হকার বেটাকে আজই ধরে বলব কাল থেকে যেন আর পত্রিকা না দেয়। আর তুমি... কোত্থেকে যে এইসব ঝা...মে...লা...

ঝামেলা। আমাকে বলছে ঝামেলা। এ কোন বাসায় সিমি এসেছে বউ হয়ে। সে ফিচ করে কেঁদে ফেলল।

বাবা হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, তাঁর নতুন বউমার কান্নাটা হুবহু তাঁর মরহুমা স্ত্রীর মতো। তাঁর স্ত্রীর কথা মনে পড়ল। আহা, বড় ভালো মেয়ে ছিল। তাঁকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। কালকে রাতেও স্বপ্নে তাকে উপদেশ দিয়ে গেছে। ও হো, তাই তো...তিনি তো মধ্য পথে চলবেন। ছি ছি, নাদিমের বউটার সাথে তিনি খারাপ ব্যবহার করলেন। এটা কি তার উচিত হলো। আর মেয়েটার কান্নাটা হুবহু নাদির-নাসিরের মার মতো।

তিনি বললেন, মা। তোমার এই কান্নার স্টাইলটা এই যে হাত দিয়ে নাক ঘষা হুবহু তোমার শাশুড়ির মতো। সে খুব লক্ষ্মী মেয়ে ছিল। তুমিও আমার ঘরের আরেক লক্ষ্মী বউ হবে।

মা তোমার সাথে কদিন খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। তুমি কিছু মনে করো না। আর কোনোদিন হবে না।

সিমি আনন্দে কাঁদতে লাগল।

তাকে দেখতে আরো বেশি করে মনে হতে লাগল আনোয়ার চৌধুরীর স্ত্রীর মতো। তিনি বললেন, শোন, তোমাকে আমি একটা ভালো জায়গায় হানিমুনে পাঠাব। কোথায় যেতে চাও।

সুইজারল্যান্ডে বাবা।

অতদূর। কেন? দার্জিলিং যাও। শিলং যাও। আগ্রা যাও। তাজমহল দেখে আসো।

সিমি বলল, আচ্ছা বাবা তাজমহল দেখতে যাওয়া যায়।

না। এক কাজ করো। তোমরা সুইজারল্যান্ড থেকে ঘুরে আসো। সেটা হোক তোমাদের হানিমুন। তারপরে আমি সবাইকে নিয়ে তাজমহল দেখতে যাব। সম্রাট শাহজাহানের অমর কীর্তি। নিজের স্ত্রীর জন্যে সেটা তিনি করে গেছেন। আমি তো সম্রাট না। আমি তাজমহল বানাতে পারব না। তাজমহল দেখতে তো যেতে পারব।

দূর থেকে এই কাণ্ড দেখে নাদিম খুশি। বড় ভাই মেজ ভাইও খুশি। বড় ভাবি মেজ ভাবি খুশি তবে একটু ঈর্ষান্বিতও।

বাবা ঘোষণা দিলেন রাত্রিবেলা আবার বড় ভোজ হবে। নাদিয়াকেও ডাকো।

রাত্রিবেলা। সবাই উপস্থিত। ভালো খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। আপা আর দুলাভাই আর ম্যাডোনা এসেছে।

বাবা বললেন, আজকে তোমাদেরকে আমি দাওয়াত করেছি একটা কথা বলার জন্যে। আমি চেষ্টা করব কিপ্টেমি কম করার জন্যে।

সবাই হাততালি দিল।

তবে, বাবা বলে চলেছেন, তোমরাও চেষ্টা করো আমাকে গোলাপি হালুয়া না খাওয়াতে।

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

বাবা বললেন, কাল রাতে তোদের মাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। সেই বলল ভালো হয়ে চলতে।

তখন হঠাৎ চঞ্চল ক্যাসেট প্লেয়ার অন করে দিল। তাতে আবার ভরানো ছিল সেই ক্যাসেটটা। যাতে বার বার করে আপার কণ্ঠে ওই অমর বাণীটা রেকর্ড করা আছে। সেটা বেজে উঠল :

বেশি অপব্যয় ভালো না। আবার কিপ্টেমিও ভালো না। মধ্য পথই শ্রেষ্ঠ পথ। নাদিমের বউয়ের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। মেয়ের জামাইয়ের সাথেও। মেয়েটা আমার বড় আদরের ছিল।

সেটা শেষ হয়েই কথা শেষ হলো না। এবার শোনা যেতে লাগল নাদিম আর আপার কথোপকথন :

ঠিক বললাম তো। তোর বউয়ের কথা থাকলে আমার জামাইয়ের কথাও থাকতে হবে।

নাদিমের গলায় : আচ্ছা ঠিক আছে থাকুক... বাবার মনটা নরম হলেই হলো। তোমার জামাইয়ের প্রতি আমার তো কোনো রাগ নাই।

সবাই তটস্থ। পিন পতন নীরবতা। কী না কী হয়।

বাবা চিৎকার করে উঠলেন, এর মানে কী? এর মানে কী? দাঁড়াও আমি সবগুলোকে আজ গুলি করব।

মেজ ভাই বললেন, করেন গুলি। করেন গুলি। আমরা মা মরা ছেলেমেয়ে। আমাদের কে দেখবে। গুলি খেয়ে মরাই ভালো। করেন গুলি। মা মা গো...মা তুমি দেখে যাও...

তখন বড় ভাই নাদিম আর আপাও মা মা বলে মাতৃহারা গোবৎসের মতো হাম্বা হাম্বা করতে লাগল।

বাবা হঠাৎ স্বাভাবিক হয়ে গেলেন, আপাকে বললেন, কী রে নাদিয়া তোর গলা? হুবহু তো তোর মায়ের মতো। মায়ের গলা পেয়েছিস। ঠিক আছে, তোর মা যা বলতে পারত, তুই তাই বলেছিস। আমি তোকে বকব না।

আর আমার নতুন বউমাও কাঁদে ঠিক তোদের মার মতো করে। তোরা আমাকে ঠিকভাবে চলতে বলেছিস। মধ্য পথে চলতে বলেছিস। আমি তাই করব।

আপা ছুটে গেলেন বাবার কাছে। বাবা আপনি এত ভালো।

নাদিম আর সিমি গিয়ে বাবাকে সালাম করল।। তারপর জোড়ায় জোড়ায় বড় ভাই বড় ভাবি মেজ ভাই মেজ ভাবি দুলাভাই আপা সালাম করতে লাগল।

আর চঞ্চল কী করল, সে তার ফুপাকে জড়িয়ে ধরল তরকারি মাখা হাত দিয়ে। তার জামাটা নষ্ট হয়ে গেল।

আপা বললেন, এই কী করলি। দিলি তো তোর ফুপার জামাটা নষ্ট করে।

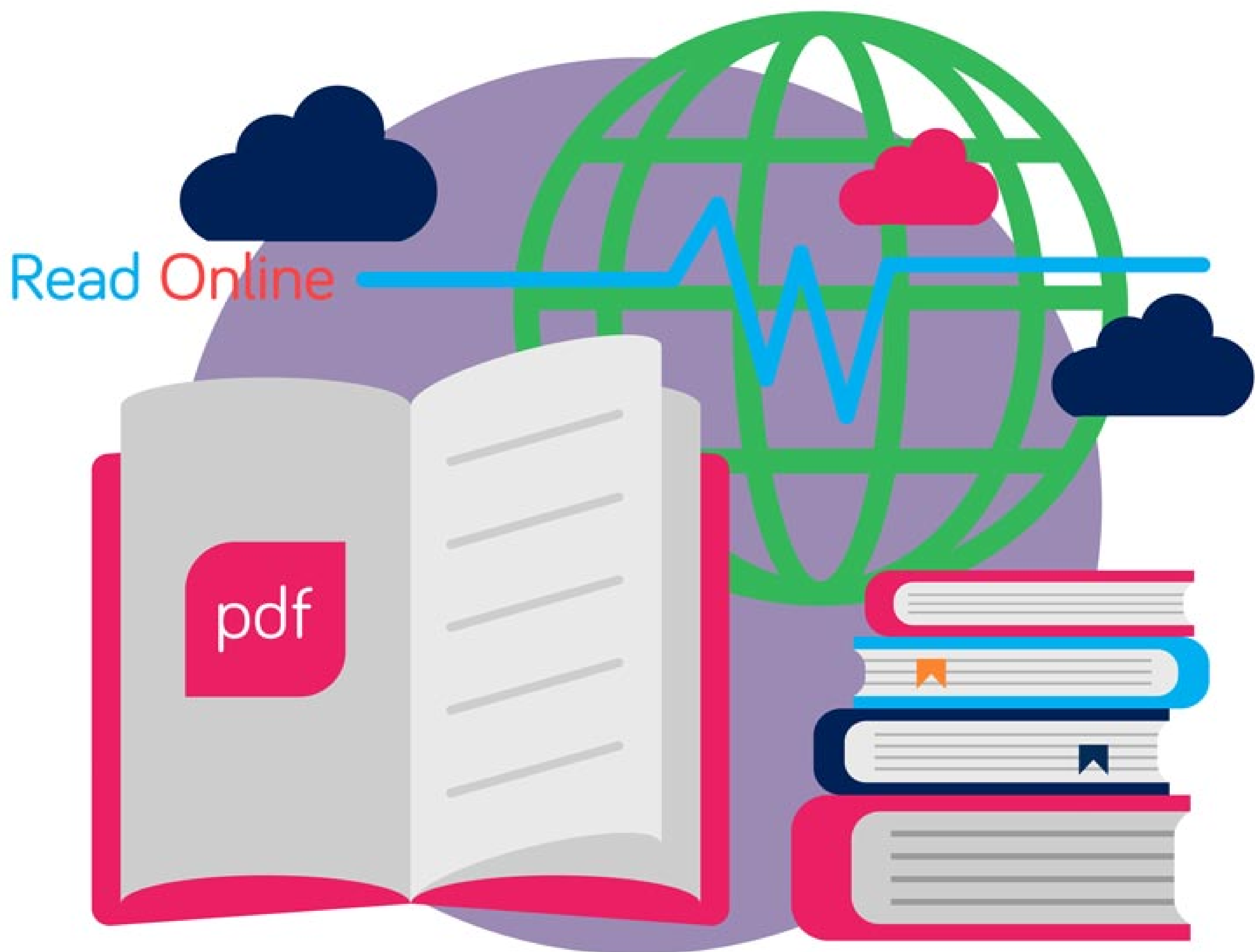
দুলাভাই বললেন, ওরে কী করলি। এখন আমি যে শার্টটা ধুতে দেব, তারও তো উপায় নাই। পানি নষ্ট হলে তোর দাদা ভাই যে অজ্ঞান হয়ে যাবেন। আর কারো শার্ট যে আমি ধার নিয়ে যাব, তাও তো হবার জো নাই। এই বাসায় কে আমাকে শার্ট ধার দিয়ে গালি খাবে।

বাবা বললেন, করুক নষ্ট। আমার একটা শার্ট ওকে পরে যেতে বলিস। একটা শার্ট কেন, ওকে পুরো স্যুট উপহার দেব। টাই সমেত।

চঞ্চল বলল, ফুপা আমার জন্যে কিন্তু তুমি এত দামি গিফট পেলে। আমাকে কী দেবে, ঠিক করে রাখো।

বাবা বললেন, তোকে ও কী দেবে। তোদের সবাইকে নিয়ে আমি ফ্যান্টাসি কিংডমে বেড়াতে যাব।

বাচ্চারা কী মজা কী মজা করে হাততালি দিয়ে উঠল।


Read Online
pdf